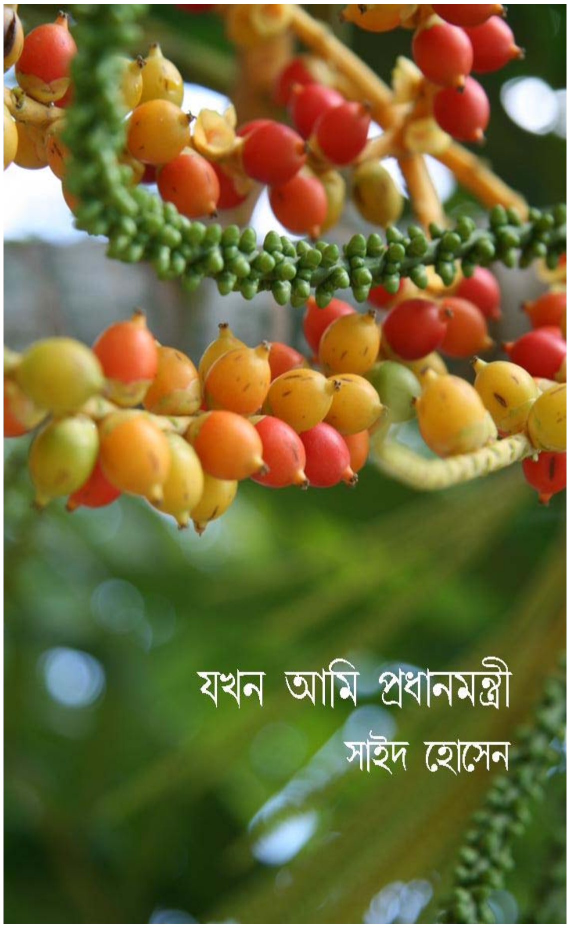
যখন আমি প্রধানমন্ত্রী
সাইদ হোসেন

যখন আমি প্রধানমন্ত্রী

**

সাইদ হোসেন

Date of first edition publication: February, 2010

© সাইদ হোসেন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Contact Address:

Sayed Hossain
Senior Lecturer of Economics
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya, Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

Design and coverpage : Sayed Hossain

© Jokhon Ami Prodhan Montri, A Bengali novel by Sayed Hossain. 2010.

© *When I am Prime Minister*, A Bengali Novel by Sayed Hossain, February, 2010.

।। ১ ।।

**ক্যামেরুন হাইল্যান্ড**

*আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম* শুনে ঘুম ভেঙে গেল । পাহাড়ের নিচ থেকে ভেসে আসছে ফজরের আজান । এ কটা শব্দের অর্থ হলো নামাজ ঘুমের চেয়ে উত্তম । শুধু মাত্র ফজরের নামাজে এ কথাটা জুড়ে দেয়া আছে । যারা নামাজ পড়েন, তাদের সবাই যে এ কথাটা জানেন, তা মনে হয় না অন্তত আমি জানতে পেরেছি অনেক দিন পরে । যেদিন থেকে জানতে পেরেছি, সেদিন থেকে ফজরের নামাজকে আঁকড়ে ধরেছি আরো শক্তভাবে ।

বিছানা ছেড়ে বারান্দার ব্যালকোনিতে এসে দাঁড়িয়েছি । সকালের আলো তখনো ফুটেনি তবে আমার বাঙলোর চারিপাশ জুড়ে বড় বড় পাহাড় মাথা উচিয়ে আছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল । কেমন নিকষ কালো বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা । এখন শুধু প্রদীপের মালিকের হুকুমের অপেক্ষা । হুকুম পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ।

পুরোটা বারান্দা কাঠের হাতলে বেড়া দেয়া । সেই বেড়ায় হাত পড়তেই হাত ভিজে এলো । বুঝলাম রাতভর শিশির পড়েছে । শিশিরে শিশিরে ভিজে গেছে বারান্দার মেঝে, চৌকাঠ আর হাতল ।

বারান্দায় বেশিক্ষণ দাড়ানো গেল না শীতের কারণে । ভেতরে গিয়ে চাদর চাপিয়ে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি । সারি সারি সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে । মেঘের আস্তরণ এসে গায়ে পড়লো । হাজার হাজার ফিট উপরে, নিভৃত এই পর্বত অরণ্যে মেঘের ছোঁয়া লাগবে সেটাই স্বাভাবিক আর এই ছোঁয়া পেতেই ক্যামেরুন হাইল্যান্ডে আস্তানা গেড়েছি ।

মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালালুমপুর থেকে গাড়ি হাকলে তিন-ঘন্টায় পৌঁছানো যায় ক্যামেরুন হাইল্যান্ডে । অত্যন্ত মজবুত, শক্ত ভিতের উপর করা হয়েছে মালয়শিয়ার সকল হাইওয়ে আর সেই হাইওয়ে মাড়িয়ে অনায়েসে চলে আসা যায় ক্যামেরুন হাইল্যান্ডে । হাজারো পাহাড়, ঘন গভীর কুয়াশা আর পুরু মেঘের স্তর এই হাইল্যান্ডের বৈশিষ্ট । এখানে রয়েছে মধু, ফুল, শাক-সবজি, স্ট্রবেরি আর চায়ের বাগান

। শীতল আবহাওয়া আর পাহাড়ী খাঁজ, এসব উৎপাদনে সাহায্য করে । পাহারের খাঁজে খাঁজে চলে এসব চাষাবাদ । ক্যামেরুন হাইল্যান্ডে গুটি কয়েক শহর আছে । এর মধ্যে তানারাতা একটি । এই তানারাতাতেই আস্তানা গেড়েছি দু-রাতের জন্য ।

অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেছি । ফজরের নামাজ হলো ক্ষুদ্রতম নামাজ, দু-রাকাতেই শেষ হয়ে আসে কিন্তু সমস্যা বাধে অন্য জায়গা । এই সাত সকালে আরামের ঘুম উপেক্ষা করে নামাজে দাড়ানো চাট্রি কথা নয় তবে কিছু নিয়ম মেনে চললে অসম্ভব হবে বলে মনে হয় । যেমন, রাতভর টেলিভিশন না দেখা অথবা এগারটার মধ্যে শুয়ে পড়া । এই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াটা আমি লতার কাছে শিখেছে, তাই ফজর ধরতে বেগ পেতে হয় না । লতার কথা এখনি লিখছি ।

ওর নাম লতা । এক সাথে আমরা অক্সফোর্ডে পড়েছি । দশটা বাজতে ও ঘুমিয়ে যেত, উঠতো ভোর পাঁচটায় । টানা সাত ঘন্টা ঘুমিয়েছে ও । ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে ইউনিভাসিটির দিকে হাঁটা দিত । আমাদের বাসা ছিল একবারে ইউনিভার্সিটি লাগোয়া তাই ক্যাম্পাসে যেতে কোন অসুবিধেয় পড়তে হতো না । তখন আমি আর লতা থিসিস লিখছি । আমার ফাইনাল ইয়ারের থিসিস । সেই সুবাদে আমাদের জন্য ছোট্র অফিস বরাদ্দ হয়েছিল অক্সফোর্ডে । সকাল ছটায় লতার কাজ শুরু হতো, লাঞ্চের আগে সব শেষ । আমরা যখন লাঞ্চের জন্য ক্যাফেটেরিয়ায় হাঁটা দিয়েছি, তখন লতা বাড়ি ফিরছে কারণ ওর অলরেডি আট-ঘন্টা কাজ হয়ে গেছে । পুরোটা বিকেল ও কাজে লাগাতো অন্য কাজে যেমন, ব্যক্তিগত পড়াশোনা অথবা লেখালেখি । মাশাল্লা ওর পাঁচটি বই বেরিয়েছে এরি মধ্যে ।

লতার মতন ওমন বন্ধু-সলুভ মানুষ আমি কম দেখেছি । ঘর-বাড়ি ঝক ঝক করে রাখে অথবা কেউ বিপদে পড়লে লতাই এগিয়ে যায় সবার আগে । কেউ জিঙেস করলে বলে, অক্সফোর্ডের সার্টিফিকেট বড় কথা নয় । সার্টিফিকেট টাঙিয়ে, ঘর আটকিয়ে বসে থাকবো যেন কেউ ভিড়তে না পারে, এটা অক্সফোর্ডের শিক্ষা হতে পারে না ।

এই লতার সুবাদে আমি সকালে উঠতে শিখেছি, তাই আমার দিনটা অনেক বড় । অনেক কাজ সেরে ফেলতে পারি সূর্যাস্তের আগেই । মানুষের জীবনে একজন ভাল সংগ যে কত জরুরি, লতার সংগে না থাকলে জানা হতো না ।

সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে আনলাম । এবার খোদার কাছে চাইবার পালা । কি চাইবো ভাবছি । মনে এসে ভর করলো রবীন্দ্রনাথের কথা ।

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাইবা দিলে সান্তনা
দুঃখকে যেন করিতে পারি জয় ।

সম্ভবত এর চেয়ে সুন্দর প্রার্থনা আর একটিও হতে পারে না । দেরি না করে কবির মতন প্রার্থনা করতে লাগলাম । সেদিন এক রবীন্দ-বিশেষঙের লেখা পড়ছিলাম । উনি লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ এ যাবৎ যত প্রেমের কবিতা লিখেছেন, সবি ঈশ্বরকে বন্দনা করে । কথাটা আমার ভাল লেগেছিলো সেদিন । বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম ।

স্কুলে থাকতেই রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হতে শুরু করি । *জল পড়ে পাতা নড়ে* দিয়ে কবির যাত্রা শুরু তারপর অজস্র কবিতা লিখেছেন তিনি, তবে সব কিছু ছাপিয়ে দুটো লাইন আমাকে সব সময়ে তাড়িয়ে ফেরে :

আগুনের পরশ-মণি ছোঁয়াও প্রাণে,
এ জীবন পূণ্য করো দহন-দানে

ছোট্ট দুইটা লাইন কিন্তু হাজারো কথা বলা আছে এর মধ্যে । এত অল্প কথায় হাজারো কথা বিশ্ব-কবির পক্ষেই বলা সম্ভব । এর পরে কতদিন পার হয়ে গেছে । সকুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ডিঙিয়ে এখন কর্ম জীবনে এসেছি, তারপরেও কোথাও গানটা বাজলে দাঁড়িয়ে যাই, যতক্ষণ না গানটা শেষ হয়ে আসে ।

নামাজ শেষ করে আবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি । এক রাশ মেঘ এসে ঘিরে ধরলো । তাকিয়ে দেখলাম পুরোটা বাঙলো নিরাপত্তার জালে বেষ্টিত হয়ে আছে, যেন ফাক-ফোকর গলিয়ে তেলাপোকাও না ঢুকতে পারে । বলতে ভুলে গেছি, আমি বর্তমানে বাংলাদেশের কনিষ্টতম প্রধানমন্ত্রী । একটি সম্মেলনে যোগ দিতে কুয়ালালুমপুর এসেছিলাম, তারপর ফেরবার পথে দু-রাতের জন্য আস্তানা গেড়েছি এই হাইল্যান্ডে ।

তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে পারিবারিক ধারায় আমার রাজনীতিতে প্রবেশ । আমার দাদা এ দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । সেই সূত্র ধরে আজকে আমি প্রধামন্ত্রী এবং বিজয় পার্টির চেয়ারম্যান । মাস ছয়েক হলো আমার দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে । এত বড় সংখ্যাগরিষ্ঠতা আজ অবধি কেউ দেখেনি । অনেকে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, ম্যাডাম, আপনার শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব আর উদারতা আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছে কিন্তু আমি জানি কারণটা সেখানে নয় । আমার দাদার সুনাম, তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে পরিবারিক প্রভাব এবং রাজনৈতিক শূন্যতা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে । আমি যে নিজের একক যোগ্যতায় ক্ষমতায় আসিনি, সেটা বুঝতে পারি এবং এই যে আমি বুঝতে পারি, সে জন্য খুদাকে হাজারো ধন্যবাদ জানাই ।

।। ২ ।।

**আমার বেড়ে উঠা**

শীতলক্ষার পাড় ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে নারায়নগন্জ শহর । তেমন বড় নয়, ঘন্টা খানেক ঘুরলে শহর শেষ । ব্যবসা-বাণিজ্য, পাটের কল, নৌঘাট, এসবের জন্য নামডাক আছে নারায়নগন্জের । ঢাকা থেকে একটানে চলে আসা যায় এই শহরে ।

চারপুরুষ ধরে আমরা আছি এই নারায়নগন্জে । নারায়নগন্জের রাস্তা ঘাট, হাট বাজার সবি আমাদের চেনা । তবে আমার চেয়ে বেশি চেনে আমার দাদা কারণ দাদা মানুষের সাথে মিশতে পছন্দ করতেন । রাস্তায় বেরুলেই সবাই সালাম করতো ।
প্রফেসার সাহেব, কেমন আছেন ?
দাদা মাথা নুয়ে সালামের জবাব দিত । কেউ ডাকলে সাথে চলে যেত ।

আমাদের আদি পুরুষেরা থাকতো চাষাড়ার দিকে । নারায়নন্জ শহরে ঢুকবার মুখে চাষাড়া । পরবর্তিতে দাদা বাড়ি কেনেন শীতলক্ষার পাড়ে । এক হিন্দু ভদ্রলোক বাড়ি বিক্রি করে বিলেত যাবেন ছেলেমেয়ের কাছে । ওখানে বাকী জীবন কাটাবেন বলে স্থির করেছেন ।
দাদাকে এসে বললো, স্যার, আমার সাধের বাড়িটা আপনাকে দিতে চাই ?
- আমার কাছে কেন ?
- জীবন কেটেছে এই বাড়িতে, তাই কেমন মায়া পড়ে গেছে । আপনার কাছে থাকলে বাড়িটা যত্নে থাকবে । যদি কখনো দেশে আসি তো দেখে যেতে পারবো ।
দাদা কিছু বললেন না । বাড়িটা কিনে নিলেন ।

বাড়ির সামনে তেমন যায়গা নেই কিন্তু পেছনে মস্ত বড় উঠোন । সে উঠোনে বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে । উঠোনের শেষে মস্ত শেওড়া গাছ । শত বছরের নিচে হবে না এর বয়স । কেমন বুড়িয়ে গেছে কিন্তু ওর নিচে দাঁড়ালে শরীর-মন ঠান্ডা হয়ে আসে ।

বাড়ির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মোটা মোটা খামের উপরে দাঁড়িয়ে আছে দোতলা বাড়ি । নিচতলাটা ফাঁকা, কাঠের সিড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে হয় । সারি সারি কক্ষ সাজানো আছে দোতলাতে । কক্ষগুলো বেশ বড়, কিছুটা লম্বাটে ধরনের । জানালা দিয়ে শীতলক্ষা চোখে পড়ে । বাড়ির ঠিক সামনে শীতলক্ষা বয়ে যাচ্ছে । রাতে-বিরেতে শীতলক্ষার গর্জন এসে কানে ভর করে ।

বাড়ির নাম আলো কুটির । আলো কুটির কথাটা সিমেন্ট দিয়ে উঁচু করে লেখা আছে । দূর থেকেও চোখে পড়ে লেখাটা । লেখাটার পাশে একটা প্রদীপের ছবি খোদাই করা আছে । আলো কুটির নামটা দাদা পরিবর্তন করলেন না । ওভাবেই রেখে দিলেন । আলো কুটির বললে যে কেউ দেখিয়ে দেয় আমাদের বাড়ি ।

এই আলো কুটিরে আমার জীবন কেটেছে । এখন যে এত ধারী হয়েছি, দেশের প্রধানমন্ত্রীর খাতায় নাম লিখিয়েছি, তারপরেও ছুটি হলে আসি অবসর কাটাতে আলো কুটিরে । দু-এক রাত কাটিয়ে যাই । পেছনে পড়ে থাকে আলো কুটির আর শীতলক্ষা নদ ।

আলো কুটিরের পেছনে বড় বড় গাছ লাগিয়েছিলেন আমার দাদা যেন গাছের ছায়ায় বসতে পারেন । আগে দাদা বসতো, এখন আর দাদা নেই । বাবা সে জায়গা দখল করেছে । ওখানে বসে দিনভর পেপার পড়েন আমার বাবা ।

মারিয়া ফেরদৌসি হোসেন আমার পুরো নাম কিন্তু দাদা আমাকে ডাকতেন টুকটুকি বলে । সবার সামনে আমি মারিয়া ফেরদৌসি হোসেন কিন্তু কেউ না থাকলে আমি টুকটুকি । আমার খুব ভাল লাগতো এই টুকটুকি ডাক শুনতে । অনেকদিন দাদা আমাকে ইশারা করে ডাকতেন কিন্তু আমি ইচ্ছে করে ভাণ করতাম, আমি শুনিনি । আমার কান খাড়া থাকতো কখন টুকটুকি ডাক শুনবো । যখনি টুকটুকি ডাক পড়তো, এক দৌড়ে চলে যেতাম দাদার কাছে । তারপর শুরু হতো আমাদের হাক-ডাক ।

এই টুকটুকি কিছু খাবি ?

আমি মাথা নাড়তাম ।

দাদা পকেট থেকে বিস্কুট বের করে দিতেন । আমি খেতে শুরু করলে দাদা এসে ভাগ বসাতেন । আমার সাথে ভাগ বসাতে দাদা খুব পছন্দ করতেন । আমরা প্রাণ ভরে বিস্কুট খেতাম ।

দাদার বাড়ির দোতলা জুড়ে আছে মস্ত বড় বারান্দা । সে বারান্দায় আমরা বসে থাকতাম ছুটির দিনগুলোতে । তখন নারায়নগন্জ শহরে অনেক বানর ছিল । ওরা এসে কার্নিশে আশ্রয় নিত । আমরা কলা ছুড়ে দিতাম । ঝটাপট খেয়ে ফেলতো ওরা ।

একটু বড় হলে দাদা আমাকে ভর্তি করে দিলেন মর্গান গার্লস স্কুলে । আমাদের বাড়ি থেকে একটু এগুলো মর্গান স্কুল । তৎকালীন নারায়নগন্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিস্টার মর্গান এই স্কুলটা করেছিলেন ১৯১০ সালে । সেই থেকে স্কুলটা এখনো আছে । এই স্কুলেই আমি ম্যাট্রিক পাশ করি জল-পানি নিয়ে । আশাতীত ভাল মার্ক নিয়ে পাশ করাতে আমার নাম উঠে এলো সকুলের খাতায় ।

আমাদের পাড়াতে লাইব্রেরি ছিল । দোতলা বাড়ি, বড় বড় থাম্বা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অনেকটা রোমান স্টাইলে বানানো । নাম দিয়েছে সুধিজন পাঠাগার । শহরের সুধিরা মিলে বানিয়েছে এই পাঠাগার । সুধিদের মধ্যে আমার দাদা অন্যতম ছিলেন ।

বিকেল চারটায় ফিরে আসতাম স্কুল থেকে তারপর আছরের নামাজ পড়ে সুধিজন পাঠাগারে হাজির হতাম । পাঠাগারে ঢুকতেই জমানো বইয়ের গন্ধ নাকে আসতো । গন্ধটা থাকতো যতক্ষণ না পাঠাগার থেকে বের হচ্ছি । আমার ভাল লাগতো গন্ধটা । শুধুমাত্র জমানো বইয়ের গন্ধ নিতেই অনেকদিন পাঠাগারে এসেছি ।

তখন কম্পিউটার প্রযুক্তি ছিল না । খাতায় নাম লিখিয়ে বই নিতে হতো । তবে বাসায় এনে পড়ার চেয়ে পাঠাগারে পড়তে বেশি পছন্দ করতাম । রামায়ণ-মহাভারত পড়েছি সুধিজন পাঠাগারে । তারপর একে একে আলেক্সান্দর পুশকিন, ম্যাক্সিম গোর্কি, শেক্সপিয়ার পড়ি, তবে সবকিছু ছাপিয়ে জীবনানন্দের কবিতা আমাকে গিলে গিলে খেতে লাগলো । এই যে এত বছর পার হয়ে গেছে, এই যে বাংলা-সাহিত্যে রং-ঢংয়ে কত পরিবর্তন এসেছে, তারপরেও জীবনানন্দ ফেবারেট । কেউ জীবনানন্দ উপহার দিলে আমি খুশি হয়ে যাই, ফলে পাঁচ-ছয় সেট জীবনানন্দ এখন আমার ভান্ডারে ।

আর উতুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে -
আমার জানালার ভিতর দিয়ে, শাঁই শাঁই করে -
সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের আজস্র জেব্রার মতো ।

তখন দাদা ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক । লম্বা ছিপছিপে মানুষ, মাথার চুল আচরিয়ে পেছনে নিয়ে যেতেন । তোলারাম কলেজে অধ্যাপনা করতেন আমার দাদা । নারায়নগন্জ শহরে ঢুকতেই তোলারাম কলেজ, এখনো আছে । শ্রী তোলারাম চক্রবর্তী কলেজটা করেছিলেন অনেক দিন আগে । সম্ভবত নারায়নগন্জের সবচেয়ে পুরাতন কলেজ এটা ।

যতদিন দাদা অধ্যাপনা করেছেন, ততদিন রাজনীতিতে জড়াননি কারণ উনার ভয় ছিল এতে শিক্ষকতার মান পড়ে যেতে পারে । ছাত্র-ছাত্রীরা বন্চিত হতে পারে শিক্ষা থেকে ।

ছাত্র-ছাত্রীরা দাদাকে ভালবাসতো সব দিয়ে, দাদাও পড়াতেন ওদের প্রাণ ভরে । তারপর একদিন দাদা অবসর নিলেন এবং গড়ে তুললেন বিজয় পার্টি । সততা, দক্ষতা আর দেশপ্রেম দাদাকে নিয়ে এলো সবার সামনে । বিজয় পাটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলো । দাদা হলেন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী । শুরু হলো তার দেশ-গড়ার পালা ।

দাদার উত্থানের পেছনে আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য কাজ করেছে । আমার দাদার বাবা, যাকে আমরা তাওয়াই বলি, একজন সু-সাহিত্যিক ছিলেন । তৎকালীন কলকাতার এলিট সমাজে উনার কদর ছিল । উনার লেখা কবিতা সরকারি পাঠ্য বইতে স্থান করে নিয়েছিল । সেই পরিচিতি ধরে দাদাকে সবাই চিনতো, ফলে রাজনৈতিক কেরিয়ার গড়তে দাদার বেগ পেতে হয় নি ।

আমার দাদা-দাদীর একমাত্র সন্তান হলো আমার বাবা, যিনি একেবারেই দাদার বীপরিত। আমার দাদা যখন রাজনীতি আর দেশ নিয়ে জীবন পার করছেন, তখন বাবার সময় কাটছে ঘরে বসে। না তিনি কোন রাজনীতিতে জড়িয়েছেন, না কারো সাথে তার পরিচয় আছে। বাইরে মেশা বলতে ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় যে ক'জনের সাথে মিশতে হয়, সেটুকুই। অবশ্য কিছুদিন বাবা সরকারি চাকরি করেছেন কিন্তু যখন বদলির হুকুম এলো বগুড়াতে, বাবা ইস্তাফা দিয়ে এলেন।

দাদাকে এসে বললেন, বাবা, আমি বগুড়া যেতে পারবো না। তুমি কিছু মনে কোরো না।

বাবা এমনভাবে বললেন যে দাদার আর কিছু বলার রইলো না। সমাজ-বিমূখ, হট্টগোল-বিমূখ, আমার বাবা নারায়নগন্জের বাড়িতে জীবন কাটাতে লাগলেন।

বাবার অবস্থা দেখে দাদা খুব কস্ট পেলেন কিন্তু কিছু বললেন। দাদার সকল আশা গিয়ে পড়লো আমার উপরে। আমাকে ঘাটিয়ে যদি কিছু পাওয়া যায়। দাদার কথা আমি রেখেছি। হলিক্রস কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে চলে যাই অক্সফোর্ডে অর্থনীতি পড়তে। তখন দাদা কেবল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছে।

দাদা আমাকে ফোন করে বললো, টুকটুকি কেমন আছিস?

আমি বললাম, ভাল। তুমি?

আমিও ভাল। তোর পড়াশোনা কেমন চলছে? এখন তো অক্সফোর্ডে অনেক শীত।

- এত শীত কখনো দেখিনি দাদা। হাত-পা জমে গেছে।

দাদা অনেকক্ষণ হাসলেন। বললেন,

আমি যখন প্রথম যাই, তখন তোর অবস্থা হয়েছিল, পরে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে। তোর পড়াশোনা কেমন চলছে?

- খুব ভাল। এখানকার শিক্ষকরা খুব যত্ন করে পড়ান। মনে হয় সারা জীবন শুধু পড়ি।

দাদা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। বললেন,

সে জন্যই তো ওরা এগিয়েছে। আমার ছালাম দিস তোর প্রফেসারদের এবং বলিস, আমি যেন তোমাদের মতন শিক্ষক হতে পারি।

- তোমার সালাম সবার আগে দিয়েছি ওদের । তোমার প্রধানমন্ত্রীত্ব কেমন চলছে ? এক বছর তো হয়ে গেলো ।

- এ দেশে অনেক সমস্যা রে । কতটুকু করতে পারবো জানি না, তবে চেষ্টা করছি ।

আমি বললাম, বাংলাদেশের কোন সমস্যাটা তোমার কাছে বড় মনে হয়েছে ?

দাদা সাথে সাথে বললেন,

এদেশের মানুষরা আইনস্টাইন হতে চায় না, তাই বিঙানে আমরা পিছিয়ে পড়ছি । যে দেশে বিঙান নেই, সে দেশ কখনো উঠবে না ।

আমি বললাম,

ইউরোপে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন । এখানে ঘরে ঘরে আইনস্টাইন । নূতন-নূতন তত্ব আর তথ্য জানবার এদের আগ্রহের শেষ নেই ।

- সে জন্যই তো ওরা এগিয়েছে, এই বলে দাদা হেসে দিলেন । আমি অনুমান করলাম দাদার নাক ফুলে উঠছে এখন, কারণ যখনি দাদাকে হাসতে দেখেছি, উনার নাককেও ফুলতে দেখেছি ।

অক্সফোর্ডে থাকা কালীন দাদা আমাকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন । কি কি সমস্যা বাংলাদেশের, কি কি সমস্যায় পড়তে হয় দেশ চালাতে, তখন সম্ভাব্য করণীয় কি, এসব বিস্তারিত লিখতেন । দাদা এসব করতেন কারণ উনি আশা করতেন একদিন আমি দাদার মতন হবো ।

একদিন আমি দাদাকে বললাম,

জওহরলাল নেহেরু তার মেয়ে ইন্দিরাকে নিয়মিত চিঠি লিখতো । চিঠিগুলো ভরপুর থাকতো হাজারো তথ্যে যেন ইন্দিরা ঙানী-গুনী হয়ে উঠতে পারে । তুমি কি সে কথা মাথায় রেখে আমাকে লেখো ?

- এক্সাক্টলি তাই, এই বলে দাদা হেসে দিলেন তারপর বললেন,

জওহরলালের স্টাইলটাই সবচেয়ে ভাল । তোর বাবাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না । চেকের লুঙি আর ফতুয়া পড়ে দিনরাত পেপার পড়ে । পেপার পড়লেই কি মহাভারত শুদ্ধ হয়ে যাবে ?

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

আরেকদিন দাদা ফোন করে বললো,

খুব ভয় হয় যদি দেশের টাকা কোনভাবে আমার আয়ের ভেতরে ঢুকে যায় । তখন গায়ের চামড়া কেটে হাশরের মাঠে ফেরত দিতে হবে ।

আমি বললাম,

তুমি যত সতর্কভাবে সরকারি সুবিধে নাও, তাতে এ হবার কথা না । যাও, তোমার হিসেব আমি রাখবো ।

দাদা বললেন, ইউরোপে বসে তুই কি হিসেব রাখবি ?

- আমি রাখবো, তুমি আমার উপর ভরসা রাখ ।

দাদা হেসে দিলেন আমার কথায় ।

অর্থনীতিতে ব্যাচেলার করবার ছ-মাস পরেই দাদা চলে যান খুদার কাছে, ফলে আমার আর দাদার হিসেব রাখা হয়নি ।

।। ৩ ।।

**আমার বাবা**

দাদার অনেক ঠেলাঠেলিতে বাবার মাস্টার্স পর্যন্ত পড়া হলো তারপর আর গাড়ির চাকা এগোয় না । দাদা চাইলেন বাবা বিলেতে গিয়ে পড়ে আসুক কিন্তু বাবার স্পষ্ট আপত্তির মুখে দাদা পিছু হটলেন । ভাবলেন ছেলের বিয়ে দিলে যদি মোড় ঘোরে ।

যথারীতি বাবার বিয়ে হয়ে গেল । ঘরে এলো আমাদের মা লক্ষী । মা লক্ষী এজন্য বলছি যে, বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার মা এক পা এগুতেন না । সবার আগে স্বামী, তারপর সব কিছু । এই যে অফিস বাদ দিয়ে, সংসার বাদ দিয়ে আমার বাবা ঘরে বসে থাকে, সে জন্য মার কোন আফসোস নেই । নীরবে নিভৃতে অতি আনন্দের সাথে আমার মা-জননী, স্বামী সেবা করে যান । বেহেস্তের চাবিকাঠি যদি স্বামী সেবায় হয়, আমার মা সবার আগে পা রাখবেন ।

বছর ঘুরতেই আমি এলাম ওদের সংসারে, তারপর শুরু হলো আমার মর্গান স্কুলে যাত্রা । তোলারাম কলেজে যাবার পথে দাদা আমাকে সকুলে নামিয়ে দিতেন তারপর ফেরবার পথে নিয়ে আসতেন । মাঝে মধ্যে বাবার সাথে যেতাম । দাদার সাথে গেলে সুবিধে হলো, গাড়ি থেকে নামবার সময় এক টাকার নোট পেতাম । তখন এক টাকা অনেকক্ষাণি । সন্দেশ-লুচি তো বটেই, মিষ্টিও কিনতে পারতাম সে টাকায় । আমার সকুলের সামনেই ছিল বোস কেবিন । ওখান থেকে কিনে খেতাম ।

আমি কিছুটা বড় হতে দাদা ভাবলেন তার ছেলের বুঝি পরিবর্তন এসেছে, ঘর সংসারে মন বসেছে । বাবাকে একদিন ডেকে বললেন,

এখন তো টুকটুকি বড় হয়েছে । তুমি না হয় বিলেত থেকে পড়ে আস । আমি এদিকটা সামাল দেব ।

বাবা চুপ হয়ে গেলেন । বাবা ভেবেছিলেন, দাদা ভুলে গেছে সে সব কথা কিন্তু এই অবেলায় যে ব্যাপারটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, বাবা তা ভাবেনি ।

দাদা বললেন, কিছু বলছো না যে ?

বাবা বললো, আমাকে ক্ষমা করবেন । আসলে আমার পড়ায় মন নেই ।

সত্যি কথাটাই বললো আমার বাবা, তাই রাগ করতে গিয়ে দাদা করলেন না । কিছু একটা বলতে নিয়ে দাদা থেমে গেলেন, তারপর আস্তে আস্তে অন্য ঘরে চলে গেলেন ।

বাবার অভ্যেস ছিল খুব ভোরে উঠবার । সবার আগে বাবার উঠা চাই, তারপর গোছল সেরে নাস্তা নিয়ে বসতেন । অনেক সময় নিয়ে নাস্তা করতো আমার বাবা । আমি আর দাদা হয়তো নাস্তা সেরে ফেলেছি, এখন টেবিল ছাড়বো কিন্তু বাবা তখনো রুটির মাথা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে । স্কুল থাকাতে আমি আর দেরি করতাম না, দাদার সাথে বেরিয়ে পড়তাম । বেরুবার মুখে দেখতাম, বাবা তখনো রুটির মাথা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে ।

নাস্তা সেরে বাবা বারান্দায় এসে বসতেন, তারপর শুরু হতো পেপার পড়া । আমাদের বাড়িতে তখন পাঁচ-ছয়টা পেপার রাখা হতো । বাংলা তিনটা, আর ইংরেজি দুটো । সকাল আটটার আগেই সে সব এসে হাজির হতো । সকালের নাস্তা সেরে, সাদা লুঙি আর ফতুয়া পড়ে, বাবা সে সব পড়তে বসতেন । দিনভর চলতো পেপার পড়া । মাঝে মধ্যে সকুল থেকে এসে দেখি বাবা তখনো পেপার পড়ছে । পেপার পড়তে যে মানুষ এত পছন্দ করে, বাবাকে না দেখলে জানা হতো না ।

আমার বাবা যাই করুক, বাবাকে আমি খুব পছন্দ করতাম, বিশেষত সাদা লুঙি আর ফতুয়া পড়ে বাবা যখন পেপার পড়তে বসতো, তখন আমি আড়াল থেকে দেখতাম ।

একদিন বাবা বললেন, কি দেখছিস পেছন থেকে ?

- তোমার সাদা লুঙি আর ফতুয়া । আচ্ছা, তুমি সাদা লুঙি পড়ো কেন ?

বাবা একটু চুপ থেকে বললেন, বড় হুজুরকে দেখিস না কেমন সাদা লুঙি পড়ে ঘুরে বেরায় । সাদা লুঙির একটা ব্যাপার আছে ।

- কি ব্যাপার সেটা ? আমি উচিয়ে জানতে চাইলাম ।

- আমি জানি না । বড় হুজুরকে জিগুাসা করিস ।

বাবার অনেক সমস্যার মধ্যে একটা সমস্যা ছিল, বাবা মুরুব্বি ছাড়া থাকতে পারতো না । সেজন্য প্রায়ই পীর-ফকির ধরে আনতো এদিক-ওদিক থেকে, তারপর ওদের নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বসতো বাড়ির বাগানে । বাসায় একজন পীর-ফকির আছে মনে হতেই বাবা নিরাপদ বোধ করতেন । কোন কারণে যদি পীর-ফকির পাওয়া না যেত, তখন বাবাই চলে যেতো ওদের আস্তানায় । তারপর রাতভর চলতো ওদের আহাজারি । এভাবে পীর-ফকিরী একটা ব্যাপার চালু ছিল আমাদের বাসায় ।

বাবার সাথে দাদার হাজার অমিল থাকলেও এই একটি জায়গায় দাদার সাথে বাবার পুরো মিল । দাদাও পীর ফকির পছন্দ করতো কিন্তু মুখ ফুটে স্বীকার করতো না । বাবা যখন পীর-ফকির নিয়ে বাগানে বসে থাকতো, দাদা সেটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো । মাঝে মধ্যে ওদের সাথে আলাপ করবার চেষ্টা করতো ।

বাবার পীরের নাম ছিল বড় হুজুর । বড় হুজুরকে প্রায় ধরে আনতো বাবা । বাবাকে পছন্দ করতো বড় হুজুর, তাই বাবার সাথে আসতে আপত্তি করতো না । মাঝে মধ্যে বড় হুজুরের সাথে দেখা হয়ে যেত আমার । তখন আমি কলেজে পড়ি ঢাকাতে । একদিন বাড়িতে ঢোকবার মুখে দেখি বড় হুজুর বসে আছেন । আমি সালাম দিলাম ।

বড় হুজুর বললেন, কেমন আছ তুমি ?

আমি হেসে বললাম, ভাল । আপনি ?

- আমি ভাল । কই থেকে ফিরলে ?

- ঢাকা থেকে ।

- কলেজ ছুটি ?

- হ্যাঁ । পুজোর ছুটি পড়েছে তিন দিনের জন্য ।

- তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে ? ম্যাট্রিকে তো খুব ভাল করলে, এবার কেমন হবে ?

- আশা করছি ভাল করবো । আপনি দোয়া করবেন ।

বড় হুজুর মাথা নাড়লেন ।

আমি একটু থেমে বললাম, বেয়াদবি না নেন তো একটা প্রশ্ন করি ?

হুজুর হেসে বললেন, করো ।

- আমাদের ধর্মে আসলে কি বলা আছে ?

- কর্মের মাধ্যমে সৎ থাকতে বলা হয়েছে । তুমি যত কাজ করবে, তত তোমার আয় হালাল হবে আর হালাল আয় ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না ।

আমি বললাম, আরো একটু বুঝিয়ে বলবেন ?

হুজুর বলতে লাগলেন,

যেমন তুমি ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করো কিন্তু ঠিক মতন ক্লাস নাও না, ছাত্র-ছাত্রীদের সময় দাও না, নূতন-নূতন তত্ব-তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দাও না অথচ মাস গেলে বেতন নাও । তখন তোমার আয় হালাল না । হারাম আয় দিয়ে নামাজ, রোজা, হজ্ব করবার দরকার নেই ।

- আরো একটা উদাহরণ দেবেন ?

- এই যে তুমি ছাত্র-ছাত্রীদের বন্চিত করলে, সেটা তোমাকে ফেরত দিতে হবে হাশরের মাঠে । আল্লাহর হক আদায় না করলে মাফ পেতেও পার, কিন্তু মানুষের হকের কোন মাফ নেই ।

একদিন আমি দাদাকে জিঙাসা করলাম, খুদাকে পেতে পীর-ফকিরের ভূমিকা কতটুকু ?

দাদা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে গেলেন ।

তাড়া দিয়ে বললাম, উত্তর দিচ্ছ না যে ?

দাদা বললেন,

এই ব্যাপারটা খুব ধোঁয়াটে । খুদাকে পেতে পীর ধরতে হবে, সেটা স্পষ্ট করে বলা নেই কোথাও, তবে খাঁটি-পীরের সান্নিধ্যে আত্মার যে উন্নতি হবে, সেটা একরকম বলে দেয়া যায় । কেন, তুই পীর ধরবি নাকি ?

আমি হেসে বললাম, তুমি ধরলে আমিও ধরবো ।

দাদা হাসলেন, কিছু বললেন না ।

আমি বললাম, কিছু বলছো না যে ?

দাদা হাসলেন আবারো ।

আমি জানি বাবার সাথে দাদার এই জায়গায় অনেক মিল । মন মতোন পীর পেলে দাদাও যে ধরবে, এতে সন্দেহ নেই ।

আমি বললাম, আমি জানি তুমিও পীর পছন্দ করো, ঠিক ?

- হু, বলে দাদা মাথা নাড়লেন ।

- কেন ?

দাদা বলতে লাগলেন, ধর্মের অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো কোথাও বলা নেই, কিন্তু পীর-ফকিররা একটা সমাধান দিতে পারে ।

- যেমন ?

দাদা বলতে লাগলেন,

যেমন ধর, খুদা আছেন কিন্তু কি তার পরিচয়, কি তিনি চান, কি করলে তার কাছে যাওয়া যাবে, এসবের সুরাহা পীর ফকিররা করতে পারে । অথবা কিছু কিছু তথ্য ওরা দিতে পারে, যা কোথাও মিলবে না ।

আমি বললাম, বাবার পীর বড় হুজুরকে তোমার কেমন লাগে ?

- দারুণ লোক । আমার সাথে দুই একবার কথা হয়েছে । লোকটা যে পীর-ফকিরির পাশাপাশি দুনিয়ার সব খবর রাখে, সেটা আলাপ করলে বোঝা যায় ।

- তাহলে তুমিও পীর মানলে পার ?

দাদা চুপ হয়ে গেলেন । বললেন,

আরও ভেবে দেখি লোকটা কতটুকু জানে । সত্যি সত্যি পীর কিনা ।

আমি বললাম, ভক্তিতে মুক্তি, তর্কে বহুদূর ।

দাদা হেসে দিলেন । আমি হাসলাম দাদার সাথে সাথে ।

দাদা আর বাবার পছন্দের কারণে আমাদের বাড়িতে পীর-ফকিরি একটা সংস্কৃতি চালু হয়েছিল । অক্সফোর্ডে যাবার পরেও দেখেছি পীর-ফকিরদের আনাগোনা আমাদের বাসায়, তবে সবচেয়ে বেশি দেখেছি বড় হুজুরকে । সাদা-লুঙ্গি আর সাদা-পান্জাবি পড়ে বসে থাকে ভদ্রলোক । দিনে একবার খান আর বাড়ির উঠোনে বসে থাকেন দিনভর, তারপর রাত নামলে লাকরি জ্বালিয়ে বসে । এসবের সহযোগী হয় আমার বাবা । পরম উৎসাহে ওদের কর্মকান্ড চলে, আর আমার দাদা সবার অলক্ষ্যে সেটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে ।

।। ৪ ।।

**বড় হুজুর**

অক্সফোর্ডে সামার ভ্যাকেশন চলছে । টানা তিনমাস বন্ধ থাকবে সবকিছু, তাই দেশে এসেছি ছুটিতে । সেই আলো কুটির, সেই শীতলক্ষা নদ । এসে দেখি শীতলক্ষার গভীরতা আরো বেড়েছে । নদীর শো শো শব্দ আরো প্রকোট হয়ে কানে বাজতে লাগলো ।

এসে দেখি বড় হুজুর বাসায় আছেন, তবে আগের চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছে ভদ্রলোক । কেমন কুজো হয়ে হাঁটে । বাবাকে দেখলাম হুজুরকে নিয়ে বসে আছে । বাগানের মাঝে লাকরি জ্বালিয়ে বসে থাকে ওরা । মাঝে মধ্যে দু-একজন এসে হাজির হয় । বিড় বিড় করে কি যেন বলে, আবার উচু স্বরে গান ধরে । সম্ভবত ময়মনসিংহ এলাকার গান ।

ও আমার বন্ধুরে,
তোরে বিনে কাটে না সময় ....

এই সময় শব্দটা এত উচুতে নিয়ে গেল লোকটা, মনে হলো দম আটকে যাবে কিন্তু ঠিক ঠিক দম ছেড়ে অন্য লাইনে চলে গেল লোকটা ।

বড় হুজুর সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই আমার । বাবার কাছে যেটুকু শুনেছি । হুজুরের কোন ছেলেপুলে নেই । বউ ছিল, তাও দশ বছর আগে মারা গেছে । কলিকাতাতে পড়েছেন বড় হুজুর তারপর পীরের লাইন ধরেন । বয়স সত্তরের নিচে না কিন্তু গা-গতরে এখনো শক্ত । আমার দাদা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও বড় হুজুরের secret admirer ছিলেন আমার দাদা । সম্ভবত পীর-ফকিরির পাশাপাশি দুনিয়ার সব খবর রাখতেন বলে দাদার নজরে পড়েছিলেন বড় হুজুর ।

একদিন বিকেলে বাগানে নেমেছি । দেখি বড় হুজুর বসে আছে মাথা নিচু করে আর থেকে থেকে মাথা নাড়ছে । শত চেষ্টায় এই লোককে যে রাগানো যাবে না, সেটা স্পষ্ট ফুটে আছে মুখে ।

আমি গিয়ে সালাম দিলাম । বললাম, হুজুর ভাল আছেন ?

বড় হুজুর হেসে বললেন, ভাল । তুমি ?

- আমিও ভাল ।

- আর কতদিন লাগবে পড়া শেষ করতে ?

- এই বছরি ব্যাচেলার শেষ হয়ে যাবে ।

- আর পড়বে না ?

- হু পড়বো । মাস্টার্স করবার প্ল্যান আছে ।

হুজুর খুশি হয়ে গেলেন । বললেন, খুব ভাল । মাস্টার্স কোথায় করবে ?

- অক্সফোর্ডেই করবো ।

- ব্যাচেলার তো করলে ইকোনোমিকসে । মাস্টার্সে থিসিস লিখবে কি নিয়ে ?

- পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেসনে ।

- তাহলে তো খুব ভাল । তুমি ইকোনোমিকস জানো আবার এ্যাডমিনিস্ট্রেসশনও জান । তোমার দাদা নিশ্চয় মত দিয়েছেন ?

- হু, বলে মাথা নাড়লাম ।

বড় হুজুর বললেন, তুমি কি কিছু বলতে চাও ?

- হু ।

- বলো ।

- আপনি কৈ কৈ ঘুরে বেড়ান ?

- যেখানে ভাল লাগে সেখানে যাই । আমার তো কেউ নেই, তাই ঘুরে বেড়াতে কোন অসুবিধে নেই । আজ এখানে, কাল ওখানে । তোমার বাবা ধরে আনলে তোমাদের বাসায় ।

- আপনি কি খুদাকে খুঁজেন ?

হুজুর চুপ হয়ে গেলেন । বললেন,

খুদাকে সবাই খুঁজে, কেউ কম আর কেউ বেশি, কেউ প্রকাশ্যে, আবার কেউ মনের অজান্তে । খুদা এমন এক জিনিষ, যাকে না খুঁজে পাড়া যায় না ।

- ঠিক কোথায় খুদাকে পাওয়া যাবে ?

বড় হুজুর চুপ হয়ে গেলেন । বললেন, ঠিক বলতে পারছিনে তবে উনি যে আমাদের গা ঘেষে আছেন, সেটা বুঝতে পারি ।

- তাহলে খুদাকে খুঁজতে এদিক-ওদিক ছুটছেন কেন ?

- ছুটবার দরকার নেই কিন্তু আমি না ছুটে পারি না । ঘরে থাকতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে ।

- হাতের কাছে খুদা জেনেও ধরতে পারছেন, সে জন্যিই কি ছুটাছুটি করেন ?

- ঠিক তাই, তুমি ঠিক ধরেছে । তোমার দাদার মতন তোমার বুদ্ধি । দোয়া করি বড় হও ।

আমি বললাম, আসল ব্যাপারটা কি ? আপনি খুদাকে খুঁজেন না খুদা আপনাকে ?

- দুটোই কিন্তু কোন এক জায়গায় গিয়ে সাক্ষাৎটা ঘটে না ।

আমি বললাম, সাক্ষাৎটা কেন ঘটে না এর কারণ কি জানা গেছে ?

হুজুর চুপ হয়ে গেলেন । বললেন, উত্তরটা আমার জানা নেই, তবে কখনো জানতে পারলে তোমাকে জানাবো ।

আমি বললাম, যারা খুদাকে খুঁজে তাদের কি বলা হয় ?

- খুদা প্রেমিক ।

আমি বললাম, খুদা প্রেমিকদের চেনবার উপায় কি ?

হুজুর চুপ থেকে বললেন,

আমরা যেমন মৃতুর খবর পেলে পিছিয়ে যাই, কিন্তু খুদা প্রেমিকেরা উল্টো । মৃত্যুর খবর শুনলে ওরা আনন্দিত হয় কারণ মৃত্যুর পর ওরা খুদার সাথে নিবিড়ভাবে মিশতে পারবে, যেটা এখানে হচ্ছে না ।

- আপনি কি খুদা প্রেমিক ?

হুজুর বললেন, না কারণ আমি মৃত্যুকে পছন্দ করি না ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য তারপর বললাম, আরো একটা প্রশ্ন করি ?

- করো ।

- ধর্ম মানে কি ?

এক কথায় উত্তর দেবো ? হুজুর মাথা নিচু করে বললেন ।

- বলুন ।

- লোভ আর হিংসা থেকে দুরে থাকাই ধর্ম । যে যত লোভ-হিংসা থেকে দুরে থাকতে পেরেছে, সে তত ধার্মিক ।

আমি বললাম, এ কথা তো গৌতম বুদ্ধ হাজার বছর আগে বলে গেছেন ।

হুজুর একটু চুপ থেকে বললেন, লোভ আর হিংসা থেকে দুরে থাকতে সব ধর্মেই বলা আছে, তবে গৌতম বুদ্ধ সেটা স্পষ্ট করে বলেছেন ।

আমি বললাম, আমি যদি গা-গতর খাটিয়ে কিছু বানিয়ে ভোগ করি, সেটা কি লোভ হবে ?

- না, কারণ তুমি তো গা-গতর খাটিয়ে বানিয়েছ । এটা লোভ হবে কেন ?

আমি বললাম, তাহলে লোভী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কি দাঁড়ালো ?

- কাজ করবার সময় লোভী ব্যক্তি সবচেয়ে কম কাজটি করবে, আর ভাগ-বাটোয়ারের সময়ে সবচেয়ে বড় ভাগটা নেবে ।

- আর হিংসা ?

হুজুর মাথা নিচু করে বললেন,

ঙান-বিঙানে কেউ এগিয়ে আছে দেখে হিংসে হলে একে হিংসা বলা যাবে না । বরং এ ধরনের হিংসা ফলদায়ক কারণ এতে ঙান চর্চার প্রতিযোগিতা বাড়ে, ফলে ঙানী-গুণী লোক বাড়ে সমাজে ।

আমি বললাম, আমার মনে হিংসা নেই কিভাবে বুঝবো ?

- যদি কারো সু-খবরে তুমি সম-আনন্দিত হয়, তখন বুঝতে হবে তুমি হিংসা থেকে বেরিয়ে এসেছো আর হিংসে থেকে বেরিয়ে আসা একটা পরম পাওয়া ।

আমি বললাম, এই হিংসা থেকে বেরিয়ে আসলে কি কি ফায়দা আছে ?

- যখন হিংসা কাজ করে, তখন মাথা পুরো কাজ করবে না ফলে মানুষের creativity নষ্ট হয়ে যায় । নূতন নূতন তত্ত্ব-তথ্য তৈরি করতে চাই পরিষ্কার মাথা । পৃথীবিতে যারা দিয়ে গেছেন, তারা সবাই অহিংস ছিলেন ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য । ভাবতে লাগলাম আর কি জিঙাসা করা যায় । বললাম, অন্য একটা কথা জিঙেস করি ?

- করো ।

- গৌতম বুদ্ধ কি নবী ছিলেন ?

হুজুর হেসে বললেন,

এত নবী-রাসুল এসেছে পৃথীবিতে, যার সঠিক খবর কেউ জানে না । তাই গৌতম বুদ্ধের নবী হওয়াটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, তবে উনি নবী হউন বা যেই হোন, সেটা বড় কথা নয় । লোভ আর হিংসা থেকে দুরে থাকাটাই যে ধর্ম, সে কথা উনি সবার আগে বলেছেন ।

আমি সাথে সাথে বললাম,

গৌতম বুদ্ধা সবার আগে বলে গেছেন কারণ তিনি সবার আগে এসেছিলেন ?

- ঠিক তাই, এই বলে বড় হুজুর মাথা নিচু করে ফেললেন ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । বসে বসে ভাবতে লাগলাম বড় হুজুরের কথা ।

।। ৫ ।।

**তথ্য-প্রধানমন্ত্রী**

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছি সপ্তাহ খানেক হলো তারপর মন্ত্রীসভা সাজিয়েছি সৎ আর দক্ষ লোক দিয়ে । বিতর্কিত কাউকে মন্ত্রী সভায় নেয়া হয়নি যেন সরকার আস্থার সংকটে না পড়ে । এই আস্থার ব্যাপারটা খুব জরুরি । যতদিন আস্থা থাকবে, ততদিন দেশের লোকের সহযোগিতা পাব আর আস্থার ভিতটা একবার কেপে গেলে আর এগুতে পারবো না । তখন ধুকে ধুকে সরকার চালাতে হবে । এতে না হবে কোন মঙল, না দেশের কিছু ।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবার পর এই প্রথম সাংবাদ সম্মেলন করছি । প্রধানমন্ত্রীর দফতরেই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে । ঠিক দশটায় শুরু হলো সম্মেলন । তাকিয়ে দেখি সাংবাদিক দিয়ে ভরে গেছে সভাকক্ষ । থ্রি-এন এর তিন সাংবাদিককে দেখা গেল সামনের সারিতে । এই থ্রি-এন নিয়ে কিছু বলি । সাংবাদিক জগতে তিন তরুণ খুব নাম করেছে । এরা হলো নজরুল ইসলাম, নাঈমুল ইসলাম এং নিলু শাওকাত হোসেন । এই তিন জনের নাম ন দিয়ে শুরু, তাই একত্রে থ্রি-এন ডাকা হয় । এই থ্রি-এন সব জায়গাতেই আছে । যেখানেই গিয়েছি সরকারি কাজে, ওদের দেখেছি । এই থ্রি-এন নিয়ে পরে আবারো বলবো ।

থ্রি-এন এর নিলু প্রথম প্রশ্ন রাখলো,

আপনাদের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল তথ্য নির্ভর অর্থনীতি করা । এই তথ্য নির্ভর অর্থনীতি বলতে আপনারা ঠিক কি বোঝাতে চাচ্ছেন ?

আমি বলতে শুরু করলাম,

তথ্য নিভর অর্থনীতি কথাটার মানে অনেক ব্যাপক কিন্তু সেদিকে না গিয়ে বলছি, তথ্য নির্ভর অর্থনীতিতে টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটে যেন তথ্য লেন-দেনে বিলম্ব না হয় । এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি, দেশের সকল কর্মকান্ড তথ্য প্রযুক্তির

মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে । যেমন, সবার আগে কোর্ট-কাচারিকে আমরা তথ্য প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসবো । কোর্ট-কাচারির সকল রেকর্ড ডাটাবেসে নিয়ে যাওয়া হবে যেন বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা কমে আসে । নদী-নালা-জমা-জমির রেকর্ড ডিজিটালি মেনটেইন করা হবে যেন জমির মালিকানা নিয়ে গ্রাম দেশে যে খুন-খারাবি চলে, সেটা বন্ধ হয় । সরকারি কেনা-বেচা, ট্যাক্স সংগ্রহ, কাস্টম কালেকশন, সব অনলাইনে হবে যেন স্বচ্ছতা আসে । এতে দূর্নীতি কমবে, তেমনি অল্প সময়ে পুরোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে । আমরা যাকে বলছি paperless government, কাগজের ব্যবহার কমিয়ে অন-লাইনে সব কিছু করা ।

আরেক সাংবাদিক দাঁড়িয়ে বললো,

তাহলে তো সরকারি কর্মকান্ডের সাথে তাল মিলিয়ে প্রাইভেট সেক্টরকেও ব্যাপক তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে । সেজন্য কি কোন ইনসেনটিভ থাকবে ?

আমি বললাম,

ইনসেনটিভ অবশ্যই থাকবে । তথ্য প্রযুক্তির উপর ট্যারিফ আমরা উঠিয়ে দেব পর্যায়ক্রমে । যে সব অফিস তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, তাদের ব্যাপক কর সুবিধে দেব । তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত ব্যবসা দশ বছরের জন্য ট্যাক্স হলিডে পাবে । আর কেউ যদি innovative ব্যবসা করতে চান, সরকার তাকে আর্থিক সাহায্য দেবে । আর এসবের দেখ-ভাল করবার জন্য আমরা আলাদা ডিপার্টমেন্ট খুলেছি, যারা এসব তদারকি করবে ।

এদিক থেকে একজন বললো,

মালয়শিয়াতে যেমন one house, one computer policy আছে, আপনারা সে রকম কিছু করতে চাচ্ছেন ?

আমি হেসে বললাম,

Exactly তাই । তবে আমরা আরো একটা সেন্টেস যোগ করতে চাচ্ছি আর তা হলো, Connectivity means productivity । যত আমরা নিজেদের মধ্যে টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত থাকবো, তত কাজটা দ্রুত সারতে পারবো । দ্রুত কাজ সারা মানেই খরচ কমে আসা আর খরচটা যখনি কমলো, উৎপাদন বাড়বে সংগত কারণেই ।

থ্রি-এন এর নজরুল বললো, তথ্য নির্ভর অর্থনীতিতে আর কোন উপাদান গুরুত্ব পাচ্ছে ?

আমি বললাম,

শিক্ষা । শিক্ষার প্রসারটা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন তথ্য-নির্ভর-অর্থনীতি আলোর মুখ দেখবে না । তাই শিক্ষায় ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা ।

- যেমন ? নজরুল বলে উঠলো ।

- জুনেই তো বাজেট । ওখানে আমরা শিক্ষা আর তথ্য প্রযুক্তি খাতে সব চেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখছি । এত বড় বরাদ্দ আগে কখনো হয় নি ।

থ্রি-এন এর নাঈম দাঁড়িয়ে বললো, আপনার মেয়াদ কালে প্রতি বছরি কি তথ্য-প্রযুক্তি আর শিক্ষায় সবচেয়ে বরাদ্দ থাকবে ?

- আমি যতদিন আছি, তাই করবো এবং আমার পরে যিনি আসবেন উনাকেও অনুরোধ করে যাবো ।

তখন একজন বলে উঠলো, তাহলে তো ম্যাডাম আপনাকে তথ্য-প্রধানমন্ত্রী বলতে হয় ?

এ কথায় সবাই হেসে উঠলো । আমিও হাসলাম ওদের সাথে ।

তখন একজন বললো, আপনাকে তথ্য-প্রধানমন্ত্রী ডাকলে আপনি কি আপত্তি করবেন ?

আমি হেসে বললেন,

তথ্য প্রধানমন্ত্রী না ডাকলেই খুশি হবো কারণ আমি এখনো কিছু করিনি, তবে যদি কখনো করতে পারি, তো ডেকেন ।

আরেকজন বললো, শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আসছে আপনার আমলে ?

- এখনো আমরা তলিয়ে দেখছি শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে যুগোপযোগি করা যায় তবে একটা ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি আর তা হলো সকুল থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় জোড় দেয়া । নিজের মাতৃভাষাকে সন্মান দিয়েই এ কাজটি আমরা করবো ।

থ্রি-এন এর নাঈম দাঁড়িয়ে বললো, ইংরেজি শিক্ষায় জোড় দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন ?

আমি বললাম,

আপনি যদি ইন্টারনেটে তথ্য খুঁজতে যান, দেখবেন তথ্যটা ইংরেজিতে দেয়া । আমার জানা মতে, ইন্টারনেটে যত ওয়েবসাইট আছে, এর নব্বই ভাগ ইংরেজিতে লেখা । আমার তথ্যটা ভুল হলে প্লিজ শুধরে দেবেন । এখন কথা হলো, ভবিষ্যতের প্রজন্ম যদি ইংরেজি ভাল না জানে, তারা তো ইন্টেরনেটের সুফল পাবে না, ফলে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাব আমরা ।

একজন বললো, তাহলে এখন আপনারা ঠিক কি করতে চাচ্ছেন ?

আমি বললাম,

অন্তত তিনটে সাবজেক্ট ইংরেজিতে পড়াতে হবে আর বাকি গুলো বাঙলায় এবং সকুল থেকেই এসব শুরু হবে । স্নাতক পর্যায়ে ইংরেজিই হবে একমাত্র মাধ্যম । সকুল শিক্ষকদের অবশ্য ব্যাপক ট্রেনিং দেবো আমরা, যেন উনারা শুদ্ধ ইংরেজিতে পড়াতে পারেন ।

আমার কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল । হঠাৎ করে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক ইংরেজি প্রসারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সম্মেলন কক্ষে । কেউ কেউ চুপ করে রইলেন, অনেকে ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগলেন । বাস্তবতার খাতিরে অনেকে আবার মেনে নিলেন ।

একটু পরে থ্রি-এন এর নিলু বললো,

শিক্ষা আর তথ্য-প্রযুক্তি খাতে সবচেয়ে বরাদ্দ দিলেই কি তথ্য নির্ভর অর্থনীতি অর্জন সম্ভব ?

আমি হেসে বললাম,

We can bring a horse to the water but we can not make him drink . তথ্য প্রযুক্তি প্রসারে দেশের মানুষ এগিয়ে না এলে সব চেষ্টা ভেস্তে যাবে । তাই দেশের মানুষকে মোটিভেট করতে হবে, তথ্য প্রযুক্তির সুফল তুলে ধরতে হবে । আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করবো আমার হয়ে কাজটা করবার জন্য ।

তখন নজরুল দাঁড়িয়ে বললো, শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তির পর অন্য কোন খাতকে আপনারা গুরুত্ব দিচ্ছেন ? সেটা কি কৃষি ?

আমি বললাম,

কৃষি খাত বলেন আর শিল্প খাত বলেন, এগুলোর উৎকর্ষ ঘটাতে চাই তথ্য নির্ভর শিক্ষিত জনগোষ্ঠী । একজন শিক্ষিত মানুষকে একটু সহযোগিতা করলে উনি এগিয়ে যেতে পারেন, পারেন নিজের ভাগ্য ফেরাতে কিন্তু যিনি কখনো বিদ্যালয়ে যাননি, তাকে হাতি-ঘোড়া দিয়েও টেনে তোলা যায় না । তাই আমরা শিক্ষা আর তথ্য খাতে সবচেয়ে বরাদ্দ রাখছি ।

- শিক্ষা আর তথ্য প্রযুক্তি প্রসারে চাই অনেক সম্পদ । সে সম্পদের জোগান কিভাবে হবে ? এক জন জানতে চাইলো এপাশ থেকে ।

আমি বললাম,

আমার সরকারের আয় সীমিত । এই সীমিত সম্পদে যেটুকুন করা যায় করবো, বাকী টুকুন প্রাইভেট সেক্টরে ছেড়ে দেব ।

- কিন্তু দেশী-বিদেশী কোম্পানী বিনিয়োগ করবে কেন ? আরেক সাংবাদিক জানতে চাইলো ।

আমি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম, আমার সরকার যতদিন আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে না পারছে, ততদিন বিনিয়োগ আসবে না । আমরা দারিদ্রের চক্রে ঘুরতেই থাকবো ।

নিলু দাঁড়িয়ে বললো, সরকারের উপর আস্থা আনবার উপায় কি ?

- সু-শাসন । আমি এবং আমার সরকার যদি দুনীতিমুক্ত হয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারি, তবে সুশাসন আসবে আর সু-শাসন এলে বিনোয়োগ আপনাতেই আসবে ।

একজন বললো, আপনার সরকার সু-শাসন বলতে কি বোঝে ?

- সু-শাসন হলো প্রধানমন্ত্রী কি করছেন, মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয়েরা কি করছেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিরা কি করছেন, সেটা সকলের নজরের আওতায় নিয়ে আসা । যখন সরকারের কর্মকান্ড নজরের আওতায় এলো, তখন আপনাতেই ন্যয়নিষ্ঠার সাথে দেশ চালাবো সরকার । এই ন্যয়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করাকেই সু-শাসন বলছি ।

এদিক থেকে একজন বললো, আপনার প্রশাসন সকলের নজরের আওতায় কিভাবে আসবে ?

আমি বললাম,

তথ্য নির্ভর অর্থনীতিতে সরকারি সকল কর্মকান্ড অনলাইনে দেয়া হয়, যেন পেছনের দরজা দিয়ে কিছু করবার সুযোগ না থাকে । ফলে স্বচ্ছতা বাড়ে আর বাড়ে সরকারের উপর আস্থা । অনেকেই বিনিয়গ করতে চান দেশে কিন্তু আস্থার অভাবে উনারা আসেন না । ফলে টাকাটা বিদেশেই রয়ে যায় । আমরা সু-শাসনের মাধ্যমে আস্থা বাড়াতে চাচ্ছি ।

- আস্থার সাথে বিনিয়োগের সম্পর্কটা আরেকটু খুলে বলুন ম্যাডাম ? এদিক থেকে একজন বললো ।

আমি হেসে বললাম,

শুধুমাত্র আস্থার পরিবেশ তৈরি করে মার্কিনীরা বিশ্বের মূলধন তার দেশে নিয়ে যেতে পেরেছে । আমরা বিশ্বাস করি, মার্কিনী প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষতার সাথে মূলধন খাটাতে জানে, ফলে কোন প্রশ্নের ধার না ধেরে আমরা ওদের হাতে টাকা তুলে দেই । ফলে ব্যবসায় ওদের মুলধনের ঘাটতি হয় না ।

- আপনি কি মনে করেন না সরকার চাইলে সু-শাসন কায়েম করতে পারে ? এদিক থেকে একজন বলে উঠলো ।

- আলবৎ পারে যদি সরকার সত্যিকার অর্থে চায় । আমার সরকারের সেটাই চ্যালেন্জ আগামী দিনগুলোতে ।

তখন একজন বললো, ঠিক কতদিন লাগবে এই সুশাসনটা আনতে ?

আমি হেসে বললাম, আমাকে কটা দিন সময় দিন ।

থ্রি এন এর নজরুল বললো, আপনি তো অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট । দেশ চালাতে অক্সফোর্ডের লোকদের সম্পৃক্ত করবার প্ল্যান আছে ?

আমি হেসে বললাম,

ঙানী-গুণী লোক দিয়ে যেমন মন্ত্রী সভা সাজিয়েছি, তেমনি অক্সফোডের লোকদের রাখবো উপদেষ্টামন্ডলীতে । সরকারের চাই অনেক তথ্য, অনেক অভিঙতা, তাই তথ্য-সমৃদ্ধ মানুষ দিয়ে সরকারি যন্ত্র সাজাতে চাই ।

নাঈম বললো, দূর্নীতি নিয়ে কিছু বলুন ?

আমি বললাম,

দূনীতি আমাদের সংস্কৃতিতে মিশে গেছে, তাই রাজনৈতিক বিবেচনায় না এনে সৎ এবং দক্ষ লোকদের দিয়ে মন্ত্রী সভা সাজিয়েছি যেন দূর্নীতির প্রকোপ কমে আসে । তবে আমার কেবিনেট কেমন আপনারা মূল্যায়ন করবেন ।

এদিক থেকে একজন বললো, আর যদি কেবিনেটের কাউকে দূর্নীতিতে জড়াতে দেখেন ?

আমি বললাম, সচিবালয় ছেড়ে বাসা-বাড়িতে থাকাটাই উনার জন্য ভাল হবে বলে মনে করছি ।

নিলু বললো,

আপনি কি মনে করেন আপনার সরকার যথেষ্ট দক্ষ তথ্য নির্ভর অর্থনীতি গড়বার কাজে ?

আমি হেসে বললাম,

দেখুন, এই তথ্য নির্ভর অর্থনীতি ধারনাটাই নূতন, তাই কিছু সময় লাগবে এ ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করতে । আশা করছি বছর ঘুরতেই একটা ফ্রেম ওয়ার্ক দাঁড়িয়ে যাবে । আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, সরকার তথ্য নির্ভর অর্থনীতির মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছে । দেশি-বিদেশী বিশেষঙরা নেমে পড়েছেন এই কাজে । ছ-মাসের মধ্যে মাস্টার প্ল্যান দাঁড়িয়ে যাবে, তারপর এর ভিত্তিতে দেশ চলবে ।

নিলু বললো, এই মাস্টার প্ল্যানটা কেন তৈরি করতে হচ্ছে ?

আমি বললাম, যে কোন কাজে স্বল্প, মধ্যম আর দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা চাই, যেন টাকাটা পানিতে না পড়ে । এই মাস্টার প্ল্যানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে ।

একজন বললো,

বিরোধী দলের সভাপতি তথ্য নির্ভর অর্থনীতি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে । এ ব্যাপারে আপনার কমেন্ট কি ?

আমি হেসে বললাম,

উনার মতন আমিও নানা অনিশ্চয়তায় ভুগছি, তবে উনি যদি আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন, তো খুব ভাল হতো । উনার দলেও তো তথ্য-বিশেষঙ রয়েছেন, যাদের পরামর্শ আমাদের কাজে দেবে ।

আরেক জন বললো, তাহলে বিরোধী দলকে সাথে নিয়েই সব করতে চাইছেন ?

- সেটাই তো হওয়া উচিত । মতাদর্শে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দেশ গড়ার কাজে আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য হওয়া উচিত । দেশের বিরোধী দলের সে মনোভাব আছে বলে আমি মনে করি ।

- বিরোধী দলকে আস্থায় রাখতে আপনারা কি কি পদক্ষেপ নেবেন ?

আমি বলতে লাগলাম,

যদিও পার্লামেন্টে আমাদের ব্যাপক সংখাগরিষ্ঠতা আছে, এর মানে এই নয় সরকার আমাদের । আমরা ক্ষমতার ভাগাভাগি করবো যেন উনারা উৎসাহিত বোধ করেন । তথ্য নির্ভর অর্থনীতির ভিত সব দল মিলেই করা চাই ।

- বিরোধী দলকে নিয়ে সব করা চাই কেন ? এদিক থেকে একজন জানতে চাইলো ।

- আমাদের অনৈক্য থাকলে অনেকে এর সূযোগ নেবে, যা আমাদের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে পারে । এ কথাটা আমি যেমন বুঝি, মাননীয় বিরোধী দলের সভাপতিও জানেন । এখন শুধু ছাড় দেয়া আর ছাড় দেয়ার প্রশ্নে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে ।

**প্যারালাল গভর্মেন্ট**

আমাদের নারায়নগঞ্জের পাড়াতেই থাকতো ফরহাদরা । গলির মাথায় মস্ত বাড়ি ওদের । বয়েসে আমার চেয়ে বছর দেড়েক বড় হবে । ওর বাবার সাথে আমার বাবা তখন ঢাকাতে চাকরি করতো । সেই সুবাদে দুই ফ্যামিলির  যোগাযোগ ছিল । বাবা অবশ্য খুব একটা যেতেন না ওদের বাসায় । ফরহাদের বাবাই আসতো বাবার সাথে গল্প করতে । সেই সূত্র ধরে ফরহাদের সাথে আমার পরিচয় । ফরহাদ ম্যাট্রিক পাশ করে নারায়নগন্জ হাই স্কুল থেকে । শহরের একেবারে মাঝে এই সকুল । আমাদের পাড়া থেকে পনের মিনিট লাগবে রিকশায় যেতে ।

ম্যাট্রিক পাশ করে ফরহাদ চলে গেল ঢাকায় । ওখানে ঢাকা কলেজে পড়লো, তারপর উড়াল দিলো বিলেতে আইন পড়তে । ওর যেমন ইচ্ছে আইন পড়ার, ওর বাবারও তাই । সত্যি সত্যি আইন পাশ করলো ছেলেটা, খুব ভাল রেজাল্ট করেছে ও, তারপর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলো মাস্টারি করতে । সেই থাকে আইন পড়ায় লন্ডনে ।

আমি যখন অক্সফোর্ডে পড়তাম, তখন মাঝে-সাঝে ওর সাথে দেখা হতো । খুব ভাল ছাত্র বলে বিলেতে নাম কুড়িয়েছে । সব দিকেই ঠিক ছিল কিন্তু সমস্যা হলো দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতো ছেলেটা । একটা মানুষ যে এত কম খেয়ে বাঁচতে পারে, ওকে না দেখলে বিশ্বাস হবে না ।

আমি বলতাম, তুমি খাও না কেন ?
ক্ষুদা লাগে না একদমি, কি করবো বলো ?

ডাক্তার পরীক্ষা করে কোন রোগ পায় না । ওর শরীরের গঠনটাই ওমন । আজ এত বছর পার হয়ে গেছে, তারপরেও ওর ব্যাপার আগের মতনি রয়ে গেছে । এখনো ক্ষুদা লাগে না কিন্তু সে জন্য যে দূর্বলতা বা খারাপ লাগা, তা বোধ হয় না । আমি অক্সফোর্ড পাশ করে দেশে এসেছি কিন্তু ওর সাথে

যোগাযোগ কেটে যায়নি । মাঝে মধ্যেই ফোন দেয় ছেলেটা । হাসি-ঠাট্টা করে, পরামর্শ দেয় । অনেক পড়াশোনা করে ফরহাদ, তাই ওর পরামর্শ আমার কাজে লাগে ।

ফরহাদ ফোন করে বললো, তারপর বাংলাদেশের প্রাইম-মিনিস্টার কেমন আছেন ?

আমি হেসে বললাম, ভাল । তুমি ?

- এই তো চলে যাচ্ছে । মাস্টারি করি, ছাত্র-ছাত্রী পড়াই । দিন পার হয়ে যায় ।

আমি বললাম, দেশে কবে আসছো ?

- ঠিক নেই, দেখি কবে আসি । তোমাদের নারায়নগঞ্জের বাড়িটা এখনো আছে ?

আমি বললাম, থাকবে না কেন ? বাবা মা থাকেন । আমি মাঝে সাঝে যাই ।

- ঐ বাসায় ছোটবেলায় খুব যেতাম । বানরগুলো এখনো আছে ?

আমি হেসে বললাম, এখন অনেক কমে গেছে । হয়তো খাবার পায় না ঠিকমতন, তাই অন্যত্র চলে যাচ্ছে ।

ফরহাদ বললো, মনে আছে তুমি এটা-ওটা ছুড়ে দিতে আর ওরা ধুপ-ধাপ খেয়ে ফেলতো কিন্তু কখনো ক্ষতি করতো না আমাদের ।

- ইয়েস, সে জন্যই তো ওরা থাকতে পারতো মানুষের সাথে মিলে মিশে ।

ফরহাদ বললো, আমাদের বাড়িটা এখনো আছে ?

- কবে ভেঙে ফেলেছে ওরা । ওখানে চারতলা উঠেছে । প্রতি তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট, সব ভাড়া দেয়া হয়েছে । ভাড়াটিয়াদের জামা-লুঙি ঝুলতে দেখি বারান্দায় ।

- কদিন পরে আমার লুঙিও ঝুলতে দেখবে ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

ফরহাদ বললো,

আমি গিয়ে থাকবো ওখানে । ওটা তো আমার জন্মস্থান । ওখানে জন্মেছি, বড় হয়েছি । এতো করে বাবাকে বললাম বাড়িটা বিক্রি করো না । বাবা শুনলো না, বিক্রি করে দিলো । সেই টাকায় গুলশানে বাড়ি কিনেছে । গুলশানে থাকা আর জন্মস্থানে থাকা কি এক জিনিষ ?

- সেজন্য বুঝি চাচার সাথে অভিমান করে দেশে আসো না ?

ফরহাদ হেসে বললো,

বলতে পারো অনেকটা । এখন দেখ, বাবা আফসোস করে । আমাকে ফোন করে অনেক দুঃখ করে । আমি কিছু বলিনা, চুপ হয়ে থাকি ।

আমি বললাম, একদম চুপ থাক ?

- হু । তুমি শোন নাই, পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ ....

আমি বললাম, শুনিনি তবে দেখেছি ।

- সেটা কি রকম ?

আমি বললাম, আমার সকুলের পাশে মন্দির ছিল, সেই মন্দিরের গায়ে কথাটা খোদাই করা আছে ।

- ওখান থেকে আমিও তো বললাম, এই বলে ফরহাদ হেসে দিল হো হো করে । অনেকক্ষণ হাসলো ছেলেটা, তারপর বললো, তোমার সকুলের পাশ দিয়ে আমিও সকুলে যেতাম । তখন দেখেছি । কথাটা খুব ভাল লেগেছিল, তাই মনে গেথে আছে আজও । মন্দিরটা এখনো আছে ?

আমি বললাম,

- হ্যাঁ আছে, তবে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে । ভক্তদের বদৌলতে এখনো দাঁড়িয়ে আছে ।

- ভাল, এই বলে ফরহাদ একটু বিরতি দিল । তারপর বললো, একটা দোষ তোমার কাছে কড়জোড়ে স্বীকার করছি আজ ।

আমি বললাম, মাফ চাইবার দরকার নেই । তোমাকে মাফ করে দিলাম ।

ফরহাদ বললো, একটু শোনোই না, তারপর না হয় মাফ করলা ?

- ঠিক আছে বলো ।

ফরহাদ বলতে লাগলো, তোমার মনে পড়ে ছোটবেলার কথা ?

- হু পড়ে ।

ফরহাদ বলতে লাগলো,

তখন তুমি ক্লাস থ্রিতে পড়ো, আর আমি ফোরে । তোমার দাদা তোমাকে পাঁচ টাকার একটা নোট দিল । ঐ যামানায় পাঁচ টাকা অনেক টাকা । তুমি করলা কি নোটটা আমাকে দেখিয়ে তোমার বিছানার নিচে গুজে রাখলা । পরদিন ঘুম ভেঙে দেখলা নোটটা নেই । তখন তোমার কান্নায় পাড়া জড় হলো । তোমার মনে পড়ে ?

- হু পড়ে । কত যে দুঃখ পেয়েছিলাম । এখন মনে পড়লে হাসি পায় । কেন, এ কথা বলছো কেন ?

- এ কথা বলছি কারণ নোটটা আমি চুরি করেছিলাম ।

- তুমি চুরি করেছিলে ?

- হু, বলে ফরহাদ চুপ হয়ে গেল । বললো, এখন আমি ক্ষমাপ্রার্থী ।

আমি চুপ থেকে বললাম,

যেহেতু আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি, তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলাম না । জানতে পারি কেন চুরি করেছিলে ?

- আলবৎ পারো । কারণ হলো ওমন চকচকা নোট দেখে লোভ সামলাতে পারিনি, তাই সরিয়ে ফেলি কিন্তু শেষমেষ হজম করতে পারলাম না । তোমাকে ফিরিয়ে দেই ।

- কই, তুমি তো আমাকে পাঁচ টাকা ফেরত দাওনি ?

ফরহাদ বললো,

চুরিটা ঘটার সাত দিন পরে তুমি আমাকে বললা, তোমার সুটকেসে পাঁচ টাকার একটা নোট পাওয়া গেছে কিন্তু কোথা থেকে এলো তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না । তুমি জান নোটটা কৈ থেকে এলো ?

আমি বললাম, না ।

- নোটটা আমি গুজে রেখেছিলাম ।

- তাহলে চুরি করেছিলে কেন ?

ফরহাদ বলতে লাগলো,

ঐ যে বললাম, ওমন কচকচা নোটের লোভ সামলাতে পারিনি । ছেলেবেলার লোভ অন্য রকম । হাতি-ঘোড়া দিয়েও ঠেকানো যায় না কিন্তু চুরি করবার পর অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলাম । কি করি, কি করি, তারপর অস্বস্তির জ্বালা সইতে না পেরে তোমার সুটকেসে চালান করে দিয়েছিলাম ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম, কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না, শুনতে পেলাম ফরহাদ হাসছে অপর প্রান্ত থেকে ।

- কি, কেমন লাগলো ? ।

আমি বললাম, আমাকে বললেই কিন্তু তোমাকে নোট টা দিতাম । চুরি করবার দরকার ছিল না ।

ফরহাদ বললো, যদি না দিতে তখন কি হতো ? তাই সে পথে যাইনি ।

আমি বললাম, ঠিক আছে, বুঝলাম । এবার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও ।

ফরহাদ বললো, ঠিক আছে করো ।

- তুমি তো বাংলাদেশের সব পত্রিকা পড়ো । আমার কথা-বার্তায় কোন অসংগতি দেখতে পাও ?

অনেকক্ষণ চুপ থেকে ফরহাদ বললো,

না । সব ঠিক আছে তবে কথা যদি আরো কম বলতে, তো আরো ভাল হতো । তুমি কথা বলবে কেন ? কথা বলবে তোমার দলের নেতারা । তুমি চুপ থাকবে, যতক্ষণ কিছু না বললেই না ।

আমি বললাম, কথা কম বলতে বলছো কেন ?

- যত কথা বলবে, তত ভুল হবার সম্ভাবনা । আমরা ভুল বলতে পারি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সে সুযোগ নেই ।

আমি চুপ থেকে বললাম, আরও কিছু বলো ।

- তোমার কথার মধ্যে প্রফেশনালিজম থাকতে হবে । উত্তেজক অথবা বাড়তি কথা বলে প্রধানমন্ত্রী পদের মর্যাদা হানি করবে না । তুমি ব্যক্তি মারিয়া ফেরদৌসি হোসেন নও, তুমি একজন প্রধানমন্ত্রী, তুমি একটা ইনস্টিটিউট ।

আমি বললাম, আমার কথার মধ্যে প্রফেশনালিজম খুঁজে পাওনা তুমি ?

- হু পাই, তবে চেষ্টা করো আরো প্রফেশনালিজম আনতে । বেশী কথা বলে আবার ভুল না করে বসো ।

- আমি কি রোবট যে ভুল বলবো না ?

- সে জন্যই তো বলছি কথা কম বলতে, যেটুকনু না বললেই । আর একটা কথা, কখনো অবাস্তব অঙ্গীকার করবে না । যেটুকুনু পারবে, সেটুকুন শুধু বলবে কারণ তুমি যা যা বলো সবি ডিজিটালি রেকর্ড হয় । পরে যে বলবে আমি এসব বলিনি, তা হবে না ।

আমি বললাম, তুমিও কি আমার কথা রেকর্ড করো নাকি ?

- করতেও পারি, এই বলে ফারহাদ হেসে দিল ।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ । কি-বাটন টেপাটেপির শব্দ পেলাম, বুঝলাম ফরহাদ টাইপ করছে ।

একটু পরে বললো, আরো একটা কথা । নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারটা সব চেয়ে প্রাধান্য দেবে । তোমার শত্রুর অভাব নেই ।

আমি বললাম, সব কিছু থেকে সাবধানে থাকবো কিভাবে ? কিছু লোককে তো বিশ্বেস করতেই হবে ।

- তুমি জান না পৃথীবিতে যত হত্যাকান্ড হয়েছে, তার একটা বড় অংশ হয়েছে ঘরের লোকের ইন্ধনে । ঘরের লোকের ইশারা ছাড়া ঘাতক ঢুকতে পারে না ।

- যেমন ?

ফরহাদ বলে উঠলো,

বাংলার সিপাহসালার মীর জাফর আলি খাঁ যখন পলাশী প্রান্তরে সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, তখন নবাবের কি করবার ছিল ? যুদ্ধে নবাব হেরেছে শুধুমাত্র ঘরের লোকের কারসাজিতে ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । ভাবতে লাগলাম আমার নিরাপত্তার কথা, আমার চিফ সিকিউরিটি কর্ণেল গুলজারের কথা । আর কেউ আঘাত করলে করতে ও পারে, কিন্তু কর্ণেল গুলজারের কথা আলাদা । উনি আমার দাদার আমলের লোক । আমাদের পরিবারের জন্য বুক পেতে দিতে নির্দ্ধিধায় ।

আমি চুপ হয়ে আছি দেখে ফরহাদ বললো, কি, চুপ হয়ে গেলে ?

- না । বলো কি বলবে ?

ফরহাদ বললো, তোমার তথ্য নির্ভর অর্থনীতি আর প্যারালাল গভর্মেন্টের খবর কি ?

আমি বললাম, তথ্য নির্ভর অর্থনীতির মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী দেশ চলতে শুরু করেছি । এখন প্যারালাল গভর্মেন্ট কিভাবে করবো, সেটাই খতিয়ে দেখছি ।

ফরহাদ বললো,

তোমার প্লানগুলো আসলেই ভাল বিশেষত প্যারালাল গভর্মেন্টের ধারণাটা । এই ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে ? পত্র-পত্রিকায় পড়ি কিন্তু তোমার মুখে শুনতে চাচ্ছি ।

আমি বলতে লাগলাম,

প্যারালাল গভর্মেন্ট মানে হলো দেশের কর্মকান্ড চলবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ছায়াতলে নয় । অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন বিচার বিভাগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, স্থানীয় সরকার, দূর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, হিউম্যান রাইট কমিশন, এরাও সরকারের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগি করে দেশ চালাবে ।

ফরহাদ বলে উঠলো, তাহলে তো সংবিধানে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে ?

আমি বলতে লাগলাম,

তৃতীয় বিশ্বের সরকাররা সংবিধান অনুযায়ী নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করে ফলে সরকার কোন ভুল করলে সেটা শুধরানোর উপায় থাকে না । তাই ক্ষমতার ভাগাভাগি করতে হবে যেন সরকার ভুল করলে বা অন্যায় করলে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান এর একটা বিহিত করতে পারে । আমার সরকার সেই লক্ষ্যে সংবিধানে পরিবর্তন আনছে যেন প্যারালাল গভর্মেন্ট চালু করা যায় ।

ফরহাদ বললো, তাহলে তো রাস্ট্র যন্ত্রের উপর তোমার খবরদারি একদমি কমে যাচ্ছ ?

- বলতে পার, এই বলে আমি হেসে দিলাম । বললাম, আমি তো রাজা-বাদশাহ নই যে সব কিছুর উপর কতৃত্ব করবো । আমি হলাম গনতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী । ক্ষমতার ভাগ দিয়ে দেশ চালানোটাই আমার কাজ ।

ফরহাদ একটু পরে বললো,

ইউরোপে কিন্তু প্যারালাল গভর্মেন্ট চালু আছে । এতে জনগন অনেক নিরাপদ বোধ করে কারণ সরকার কোন অন্যায় করলে বিচার বিভাগ এসে পাশে দাঁড়ায় । তুমি কি দেশকে ভাগ করারও চিন্তা করছো নাকি ?

- সে রকমি ইচ্ছে । দেশকে চারটি প্রদেশে ভাগ করবো এবং প্রতি প্রদেশে নিজস্ব সরকার থাকবে । ওরাই প্রদেশের দেখ-ভাল করবে । কেন্দ্রীয় সরকার আর প্রাদেশিক সরকার সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতার ভাগাভাগি করে দেশ চালাবে ।

- এটা কি সম্ভব ?

আমি বললাম,

পার্লামেন্টে আমাদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাই সংবিধানে পরিবর্তন আনতে কোন অসুবিধেয় পড়তে হবে না । আশা করি মাননীয় বিরোধী দলের নেতারা আমাকে সায় দেবেন ।

ফরহাদ হেসে বললো,

শুধু বিরোধী দল নয়, দেশের জনগনও তোমার পাশে থাকবে । আশা করি তথ্য নির্ভর অর্থনীতি আর প্যারালাল গভর্মেন্ট দাঁড়িয়ে যাবে তোমার আমলেই । তুমি যে দেশের স্বার্থে নিজের ক্ষমতা খর্ব করছো, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই । তুমি আসলেই টুকটুকি ।

আমি হেসে বললাম, তুমি আমাকে টুকটুকি বলছো কেন ? এটা তো আমার দাদাজী ডাকতেন ।

ফরহাদ হেসে বললো, তুমি তোমার দাদাজীর কথা রেখেছো, তাই আমার কাছে তুমিও টুকটুকি ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

।। ৭ ।।

**থ্রি-এন**

তরুণ তিন সাংবাদিককে অনন্য অবদান রাখবার জন্য পুরষ্কার দেয়া হবে । প্রথমজন দৈনিক জামানার নজরুল হোসেন, দ্বীতিয়জন, সাপ্তাহিক যুমনার নাঈমুল ইসলাম আর তৃতীয় ব্যক্তিটি দৈনিক নিশানের নিলু শাওকাত হোসেন । সাংবাদিক জগতে এদের ডাকা হয় নজরুল, নাইমুল আর নিলু বলে, সংক্ষেপে থ্রি-এন । পেশাদারিত্বের কারণে ওদের পুরষ্কার দেয়া হবে এবং সেটা আমার হাত দিয়ে হবে ।

পুরষ্কার সভায় এক প্রস্ত তালি পেল তিন সাংবাদিক । পুরষ্কার নেবার পর কিছুক্ষণ কথা বললো ওরা সবার উদ্দেশ্যে । আমাকে ধন্যবাদ জানালো পুরষ্কার দেবার জন্য । অনুষ্ঠান শেষে আমি ওদের চায়ের আমন্ত্রণ জানালাম আমার বাসায় । ঠিক হলো বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ওরা আসবে । ওদের নিয়ে বাড়ির পেছনে চা-খেতে বসবো ।

সারাদিন অফিস করে বাসায় ফিরেছি তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নামাজ পড়ে নিলাম । অফিসের কাপড় পাল্টে লনের দিকে হাঁটা দিয়েছি । লনে এসে দেখি ওরা এসে গেছে ।

আমি বললাম, প্লিজ বসুন ।

ওরা বসলো আমার তিনদিকে ।

চারিদিকে খোলা উদ্যান । এদিকে একটা লেক বয়ে গেছে, ডানদিকে পানির ফোয়ারা আর এরি মাঝে আমার থাকবার সরকারি বাড়ি । পুরোটা এলাকা কঠোর নিরাপত্তায় ঘিরে আছে, যেন কেউ ঢুকে না পড়তে পারে আর এই কাজটির দায়িত্বে আছে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনী ।

আমি বললাম, তারপর বলুন কেমন আছেন ?

নাঈম বলে উঠলো, খুব ভাল, ম্যাডাম । সবার আগে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমন্ত্রণের জন্য ।

আমি বললাম,

আজ আপনাদের ডেকেছি একটু গল্প করবার জন্য । এটা ইনফর্মাল সাক্ষাৎ । কোন সংকোচ না করে আমার সাথে চা খাবেন ।

সবাই খুশি হয়ে গেলো আমার কথায় । ওরা হালকা বোধ করতে লাগলো । তাকিয়ে দেখলাম ওদের টানটান ভাবটা আর নেই । কিছুটা এলিয়ে বসেছে ওরা ।

আমি বললাম, জানতে পারি আপনারা কে কোথায় লেখাপড়া করেছেন ?

নাঈম বললো,

আমরা তিনজনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি । নজরুল আর নিলু আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট । ওরা দুজন আবার মাস্টার্স করে এসেছে ইউরোপ থেকে, যা আমার ভাগ্যে জোটেনি ।

আমি বললাম, তো ইউরোপে কোথায় পড়লেন ?

নজরুল বললো, আমি ফ্রান্সে আর নিলু সুইডেনে ।

আমি বললাম, আরো পড়বার ইচ্ছে আছে ?

নজরুল বললো, পড়লে খারাপ হতো না, চেষ্টা করছি । আপনার কি প্ল্যান, ম্যাডাম ?

আমি বললাম,

আমি তো ব্যাচেলার শেষ করেছি । মাস্টার্স করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু হঠাৎ করে দাদা ইন্তেকাল করাতে আর এগুতে পারিনি । এখন পড়তে ইচ্ছে হয় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কি পড়তে যেতে পারে ?

আমার কথায় সবাই হেসে উঠলো । আমিও হাসলাম অনেকক্ষণ । তারপর বললাম, নিন, চা নিন, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে ।

ওরা চা তুলে নিল ।

ওদের সাথে কথা বলে আমার ভাল লাগলো । সম্ভবত বয়েসে আমার চেয়ে খুব একটা বড় হবে না, তাই স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগলাম । বড় বড় মানুষের সাথে আলাপে বসলে কেমন অস্বস্তিতে পড়তে হয় কিন্তু এখন তা বোধ হলো না । মনে হলো আমরা একই দলের ।

চা খেতে খেতে নাঈম বললো,

আপনি যে অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট, সেটা আপনার আন্তরিকতায় ফুটে উঠেছে । আমরা কখনো ভাবিনি আপনার বাড়িতে চা খাব ।

আমি হেসে বললাম, কেন, আমার বাসায় চা খেতে অসুবিধে কোথায় ?

- অসুবিধে নেই কিন্তু ব্যাপারটা কখনো ঘটবে ভাবিনি । আপনাকে আবারো ধন্যবাদ ।

আমি হেসে বললাম,

এত ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই । আজ আমাদের ইনফর্মাল আসর । আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন । আপনারা কে কোথায় থাকেন জানতে পারি ?

নাঈম বলো,

আমরা উত্তরাতে থাকি । ইচ্ছে করে কাছাকাছি বাড়ি নিয়েছি যেন নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি । আমার এক মেয়ে, স্কুলে যাবে আগামী বছর । নজরুল আর নিলু এখনো বিয়ে করেনি । নজরুলের বিয়ের কথা চলছে আর নিলু তো বিয়ে করবে না । অফিসের পর নিলুর বাসায় গেলে দেখবেন চেকের লুঙি আর ফতুয়া পড়ে পেপার পড়ছে । কি ছুটির দিন, কি অন্যদিন, বাসায় বসে পেপার পড়া চাই অথচ সারাদিনের খবর কিন্তু নিলুর জানা ।

সাথে সাথে নিলু বলে উঠলো, ম্যাডাম, নাঈম অনেক বাড়িয়ে বলছে ।

আমার মনে হলো বাবার কথা । আমি ভেবেছিলাম আমার বাবাই বুঝি চেকের লুঙি আর ফতুয়া পড়ে দিনভর পেপার পড়েন । পাঁচ-ছয়টা পেপার রাখা হয় আমাদের নারায়নগঞ্জের বাসায়, আর বাবার কাজ হলো ওগুলো মুখস্থ করা । বাবার মতন মানুষ যে আরো আছে, সেটা জানা ছিল না ।

আমি বললাম, নিলু সাহেব, আপনি কি দিনভর পেপার পড়েন ?

কি বলতে নিয়ে নিলু বললো, হ্যাঁ পড়ি, পেপার পড়তে আমার ভাল লাগে ।

আমি বললাম, যে খবরটা আপনার জানা, সেটা পড়ছেন কেন ?

নিলু হেসে বললো, এটা একটা দোষ বলতে পারেন কিন্তু এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না । পেপার না পড়ে স্বস্তি পাই না ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

চা খেতে খেতে নাঈম বললো, যদি অনুমতি দেন তো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি ?.

আমি হেসে বললাম, করুন ।

নাঈম বললো, আপনি হলেন বাংলাদেশের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী এবং অবিবাহিতা । এ নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলে । আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

আমি হেসে বললাম,

দেশের লোক যাই বলুক, আমি ক্ষমতায় এসেছি আমার যোগ্যতায় নয় । তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে পারিবারিক প্রভাব, দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক শুন্যতা আর দাদার সুনাম আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কিন্তু দৈবাৎক্রমে আমি হয়ে গেছি অবিবাহিতা । এখানে তো কিছু করবার নেই আমার ।

নজরুল বলে উঠলো,

বয়সটা না হয় বাড়ানো যাবে না কিন্তু বিয়ে সাদি করতে তো অসুবিধে দেখছি না ?

নজরুলের কথায় সবাই হেসে উঠলো, আমিও হাসলাম এক প্রস্ত । বললাম,

প্রধানমন্ত্রী পরিবারের সদস্য হওয়ায় আমাকে অনেক চিন্তা করে চলতে হয়েছে । দাদার হুকুম ছিল অক্সফোর্ড থেকে বেরুবার আগে কোথাও যেন জড়িয়ে না যাই । আমি দাদার কথা রেখেছি কিন্তু দাদা তার কথা রাখেন নি । গ্র্যাজুয়েট হবার ছয়-মাস পরে দাদা চলে যান ।

নজরুল বললো, তাও তো ম্যাডাম অনেকদিন হয়ে গেল । এখন কি ভাবছেন ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম । বললাম,

দেখা যাক কি হয় । আগে সরকার গুছিয়ে নেই তারপর চিন্তা করবো, এই বলে ওদের কেক বাড়িয়ে দিলাম । ওরা কেক তুলে নিল ।

নিলু বললো,

যেহেতু আপনাকে আজ মুখোমুখি পেয়েছি, তাই প্রশ্নটা রাখছি । আমরা জানতে চাই আপনার বাবা সম্পর্কে । উনাকে নিয়ে কৌতুহলের শেষ নেই আমাদের ।

নিলুর কথায় সবাই সায় দিল ।

আমি বললাম, আমার বাবাকেই জিঙাসা করুন, যা জানতে চান ।

নাঈম বললো,

সে চেষ্টা আমরা বহুবার করেছি । উনি না টেলিফোনে, না মুখোমুখি কোন সাক্ষাৎকার দেবেন । কোনভাবেই উনার নাগাল পাওয়া যায় না । তাই বলছিলাম, আপনি যদি কিছু বলতেন ?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

সাক্ষাৎকার দিতে বাবা রাজি হননি বলে কিছু মনে করবেন না । বাবা ওই রকমি । একা একা থাকতে পছন্দ করেন, নীরবে নিভৃতে সময় কাটে ওর ।

সবাই চুপ হয়ে গেল আমার কথায় । নিলু কিছু বলতে নিয়ে থেমে গেল । এদিকে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে ।

নজরুল বললো, ম্যাডাম, আমাদের আর একটা কথা জানতে বাকি আছে ?

- বলুন ।

- আপনার ব্যক্তিগত সবচেয়ে পছন্দের জিনিষ কোনটি ?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

গ্রাম দেশে ঘুমুনোর আগে টিনের চালে যে ঝর ঝর করে বৃস্টি নেমে আসে, সেটাই সবচেয়ে সুন্দর । অনেক দেশ দেখেছি কিন্তু রাত-বিরেতে টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার মতন সৌন্দর্যতা কোথাও দেখিনি ।

আমার কথায় ওরা হেসে দিল । আমিও হাসলাম ওদের সাথে ।

॥ ৮ ॥

## রাত বিরেতে

রাত-বিরেতে ঘুরতে বেরিয়েছি । একজন প্রধানমন্ত্রীর রাত-বিরেতে ঘুরতে বেরুনোটাই সুবিধেজনক কারণ দিনের বেলায় নানা কারণে সম্ভব হয় নয় । ঠিক করেছি সংসদ ভবনের আশেপাশটা ঘুরবো ।

শক্ত মজবুত বুলেট প্রুফ পাজেরোতে চড়ে বসেছি । কোন প্রটোকল নেই তবে আমাকে সংগ দিচ্ছে আমার চিফ সিকিউরিটি কর্ণেল গুলজার । ওদের সাথে আছে মেজর পদ-মর্যাদার আরেক অফিসার । সামনের সিটে বসেছে ওরা । দুজনে সিভিল ড্রেসে আছে তবে ওরা যে ভারি অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছে, সেটা আঁচ করতে পারলাম ।

সংসদ ভবন এলাকার আশ-পাশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ঘন্টা খানেকের জন্য । সিভিল ড্রেসে গোয়েন্দারা ঘুরে বেড়াবে কিন্তু কেন নিরাপত্তা জোড়দার করা হলো, তা জানানো হয়নি । শুধু বলা হয়েছে, বারটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত টহল চলবে ।

খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছে আমার গাড়ি । তাকিয়ে দেখলাম বা দিকে থামের মতন দাঁড়িয়ে আছে সংসদ ভবন । রাস্তার নিয়ন বাতি এসে পড়ছে আমার জানালার কাচে । দেখলাম থ্রি-এন এর নিলু সাহেব ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এক মহিলার সাথে কথা বলছে । কথা বলতে গিয়ে নিলু কিছুটা ঝুকে পড়েছে । অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল, নানাভাবে সাজার চেষ্টা করেছে মহিলা কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠছে ।

আমি বলাতে আমার চিফ সিকিউরিটি নিলু সাহেবকে ডেকে আনলো । গাড়িতে উঠবার আগে দুই প্রস্ত চেক করা হলো নিলু সাহেবকে ।

নিলু উঠে এলো গাড়িতে । আমার পাশে বসলো । আমাদের কথা-বার্তা কেউ শুনতে পাবে না কারণ কাচে ঘেরা আছে আমার সিট বরাবর ।

আমি বললাম, আপনার সময় নিলাম না তো ?

- কি যে বলেন, ম্যাডাম । আমাকে ডেকেছেন, এটাই তো সাত রাজার ভাগ্যি ।

আমি হেসে বললাম, একটু বাড়িয়ে বললেন না তো ?

- দেশের প্রাইম-মিনিস্টার রাত-বিরেতে হ্যালো বলবে, সেতো ভাগ্যবানদেরই জুটবে । বাড়িয়ে বলিনি এতটুকু । তো ম্যাডাম, রাত-বিরেতে এদিকে ?

- না এমনি ঘুরতে বেরিয়েছি । সংসদ ভবনের আশেপাশটা ঘুরবো ।

- সে জন্যই তো বলি আজ ফুটপাতে গোয়েন্দা কেন ?

আমি বললাম, কিভাবে বুঝলেন ওরা গোয়েন্দা ?

- সাংবাদিকতাই আছি পাঁচবছর । নানা ধরনের মানুষের সাথে মিশতে হয় । গোয়েন্দাদের দেখলেই চিনতে পারি, এরা পুলিশের লোক ।

আমি বললাম, আপনাকে একটা অনুরোধ করবো ?

- করুন ।

- আমি যে রাত-বিরেতে ঘুরতে বেরিয়েছি, এ নিয়ে কোন ফিচার লিখবেন না ।

- আপনি একা নন, ম্যাডাম । অনেক ভিআইপি তাই করেন কারণ উনারা রাতেই সময় পান । কথা দিচ্ছি এ নিয়ে কোন ফিচার হবে না ।

আমি বললাম, তো রাত-বিরেতে আপনার সাংবাদিকতা কেমন চলছে ?

নিলু বললো, ওখানে দাঁড়িয়ে এক মহিলার সাথে কথা বলছিলাম । আপনি নিশ্চয় দেখেছেন আমাকে ডাকবার সময় ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । বললাম, উনি আপনার পত্রিকার কেউ ?

- না । ও একজন প্রোস্টিটিউট, রাত-বিরেতে ঘুরে বেড়ায় ।

প্রোস্টিটিউট শুনতেই উৎসাহ বোধ করতে লাগলাম । ওদের নিয়ে অনেক গল্প শুনেছি । নিলু সাহেবের ফিচারো পড়েছি । প্রথম থেকেই ওদের নিয়ে আগ্রহ ছিল, তাই সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না । বললাম, তো কি আলাপ করলেন ?

নিলু লাগলো,

রাত আটটা বাজতেই ওরা ঘুর ঘুর করে প্রধান সড়কের আশেপাশে । খদ্দের পেলে ভাল আর না পেলে খুব অসুবিধেয় পড়তে হয় । ওদের দুঃখের শেষ নেই ।

আমি বললাম আরো কিছু বলুন ?

নিলু বলতে লাগলো,

এই দেশে যদি কোন অবহেলিত গোষ্ঠী থাকে, তা হলো প্রোস্টিটিউটরা । এদের না আছে কোন পরিচয়, না আছে যাবার যায়গা । যতদিন শরীর আছে, ততদিন ওরা আছে, তারপর মরে গেলে একটা লোকও দাঁড়ায় না ওদের কবরের পাশে ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । আমার মনে হতে লাগলো, ওরা আমারি মতন মেয়ে । দামি গাড়িতে ঘুরছি, ভাল-মন্দ খাচ্ছি, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিচ্ছি, আর ওরা দু-মুঠো ভাতের জন্য রাত-বিরেতে ঘুরে বেড়ায় । খদ্দের জুটলে ভাল, অন্যথায় হয়তো উপোস করতে হয় । ওদের দুঃখ দুর না করতে পারলে হাশরের মাঠে ওরা আমার জামা টেনে ধরবে ।

আমি বললাম, আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?

- ঠিক কি ধরণের সাহায্য চাচ্ছেন ?

আমি বললাম,

যেমন ধরুন, আমার সরকার ওদের জন্য কি করতে পারে, কি করলে ওদের ভাল হবে । যেহেতু আপনি ওদের নিয়ে কাজ করেন, আপনি ভাল বলতে পারবেন ।

নিলু মাথা নিচু করে আনলো । কিছুক্ষণ পরে বললো, আমাকে কদিন সময় দিন । আমি একটু ভেবে দেখি ।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, এমন একটা উপায় বের করুন, যেন ওদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে না হয় । দেশের আট-দশটা মেয়ের মতন ওরা চলতে পারে ।

নিলু মাথা নেড়ে সায় দিল । ও যে আমার কথায় খুশি হয়েছে, সেটা ওর চেহারায় স্পষ্ট ফুটে উঠলো ।

আমি বললাম, আপনি যে রাত-বিরেতে সাংবাদিকতা করছেন, তাহলে তো আজ আর পেপার পড়া হলো না ?

নিলু হেসে বললো, হ্যাঁ বলতে পারেন, তবে কাল ছুটি । ইনশাল্লাহ দিনভর পড়বো ।

আমি বললাম, সত্যি সত্যি কি চেকের লুঙি আর ফতুয়া পড়ে পেপার পড়েন ?

নিলু মাথা নেড়ে সায় দিল । বললো, এ কথা জানতে চাইছেন কেন ? সেদিনও দেখলাম লুঙি আর ফতুয়া শুনে অবাক হলেন । কোন কারণ আছে কি ?

আমার বাবা যে লুঙি আর ফতুয়া পড়ে দিনভর পেপার পড়েন, সেটা চেপে গিয়ে বললাম, না এমনি । আজকাল তো অনেকেই এসব পড়ে না, তাই বললাম ।

নিলু চুপ হয়ে গেল, কিছু বললো না । তাকিয়ে দেখলাম গাড়িটা এগুচ্ছে লেকের পাড় দিয়ে । ফুটপাতের নিয়ন বাতি এসে পড়েছে পায়ের কাছে ।

নিলু বললো, আপনাকে একটা কথা জিঙেস করতে পারি ?

- করুন ?

- নির্ভয়ে না স্বভয়ে ?

আমি হেসে বললাম, আপনি কি হবুচন্দ্র রাজার কাছে অনুমতি চাইছেন ?

নিলু হেসে দিল ।

আমি বললাম, যা জানতে চান, জিঙাসা করুন ।

নিলু বলতে লাগলো,

আপনার সরকারের এক বছর পার হলো । আমরা ঈদ, পূজা, বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, সবি করলাম । আপনি আন্তরিকতার সাথে সব করলেন কিন্তু দুই ঈদে আপনার অফিসে যত ধুমধাম হলো, পূজা বা বড়দিন বা বৌদ্ধ পূর্ণিমাতে ঠিক অতটা হলো না । এর কারণ কি ?

আমি বললাম, আপনার কি মনে হয়েছে সরকারের গাফলতি হয়েছে ?

নিলু মাথা নেড়ে সায় দিল । বললো,

ম্যাডাম, আপনি এখন প্রধানমন্ত্রী আর আমরা প্রজা । এই প্রধানমন্ত্রী পদটি রাষ্ট্রীয় পদ আর এই পদে যিনি আসীন হবেন, তিনি সকল বিশ্বাসের প্রতি সমান শ্রদ্ধা রেখে দেশ চালাবেন, এটাই প্রত্যাশা । কোন বিশেষ গোষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়লে আপনি প্রধানমন্ত্রী নন, আপনি অন্য কেউ ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

এ বছর যদি গাফলতি হয়ে থাকে আগামী বছর থেকে হবে না । আপনার কোন সাজেশন আছে এ ব্যাপারে ?

- আমার সাজেশন লাগবে না । আপনার দফতরেই অনেক ঙানী-গুনী পাবেন, যারা বলতে পারবে । অন্য ধর্মকে সম্মান দেয়া যে আরেক ধর্ম, সেটা মাথায় রেখেই দেশ চালাতে হবে । সরি, উপদেশ দিয়ে ফেললাম ।

নিলুর কথাটা আমার ভাল লাগলো । আমি চুপ হয়ে ভাবতে লাগলাম । বললাম, আপনি কোন উপদেশ দেননি বরন্চ সাহায্য করলেন । আপনাকে ধন্যবাদ ।

মনে এসে ভর করলো বড় হুজুরের কথা । বড় হুজুর ঠিক এ ধরণের কথা বলে । অন্য ধর্মকে সম্মান দেয়া যে আরেক ধর্ম, সেটা আবারও অনুভব করলাম ।

আমি বললাম, নিলু সাহেব, আরো কিছু বলুন ।

নিলু বলতে লাগলো,

প্রথমেই আপনার সহিষ্ণুতার জন্য ধন্যবাদ জানাই । বিরোধী দলের সাথে আপনি যে ভাষায় আচরণ করেন, সেটা পাশ্চাত্যের শিষ্টাচারকে হার মানিয়ে যায় । এতে আপনার ভাবমূর্তি বেড়েছে, বেড়েছে জনগনের আস্থা । আপনি যে সহিষ্ণু রাজনীতিতে বিশ্বাসী, সেটা বলে দেয়া যায় ।

- আরো কিছু বলুন ?

নিলু বললো, বলুন তো রোমিও-জুলিয়েট বইটা কেন লেখা হয়েছে ?

আমি হেসে বললাম, যতদূর জানি এটা প্রেমের গল্প । কেন এর অন্য কোন মানে আছে নাকি ?

নিলু বললো,

কোন প্রেম দেখানোর জন্য সেকসপিয়ার বইটা লিখেননি । দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ কিভাবে করুণ পরিনতি ডেকে আনে ওদের জীবনে, সেটা দেখানোর জন্যই বইটি লিখেছেন তিনি ।

রোমিও-জুলিয়েট নিয়ে এই অপ্রচলিত মন্তব্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম । কি জবাব দিবো ভেবে পাচ্ছি না । বললাম, ঠিক আছে আপনার কথা না হয় মেনে নিলাম কিন্তু এই রাত-বিরেতে রোমিও-জুলিয়েট আসছে কেন ?

নিলু হেসে বললো,

আমাদের রাজনৈতিক পরিবারেও দুটো প্রধান দল, আর উনারা যদি গৃহ-দাহে জড়িয়ে পড়েন তো দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? তবে আপনি যে সহিষ্ণু সংস্কৃতি চালু করছেন, তাতে গৃহদাহ হবে বলে মনে হয় না ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । বললাম,

গৃহদাহ যেন না হয় সে চেষ্টা আমি করবো আর যদি ব্যাপারটা ঘটে, তা হবে আমার সরকারের ব্যর্থতা ।

নিলু চুপ হয়ে গেল । দেখলাম, ও যেন কি ভাবতে শুরু করেছে ।

আমি বললাম, আরো কিছু বলুন ?

নিলু হেসে বললো, একজন সামান্য সাংবাদিক অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েটকে কি নসীহত করবে ?

আমি হেসে বললাম, আপনিও তো ইউরোপে পড়াশোনা করেছেন । আমার ঙান কখনো আপনার চেয়ে বেশি নয় ।

নিলু বললো,

আপনার দলের কিছু লোকের কথা শুনে মনে হয় উনারা অনেক শক্তিধর কারণ দল ক্ষমতায় । এ ব্যাপারটা কেন হবে ? শক্তি তো আমাদের হাতে, যারা ভোট দিয়ে সরকার গঠন করি ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । বললাম, আমার দলের কতভাগ নেতার মধ্যে এই প্রবণতা দেখতে পান ?

নিলু বললো, সবার মধ্যে অবশ্যই নয় । আপনার দলে অনেক লোক আছেন, যারা দেশের জন্য অবলীলায় বুক পেতে দেবে ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

আমার দলের কোন অন্যায় আবদার আমার সরকার প্রশ্রয় দেবে না কারণ আমি শপথ নিয়েছি রাষ্ট্রের অনুকূলে, দলের পক্ষে নয় । আমার মাননীয় মন্ত্রী সভাকে সেভাবে বলে রাখা হয়েছে । অফিস ধরে রাখতে চাইলে সে সব মাথায় রেখে অফিস করতে হবে ।

নিলু হেসে বললো, আপনাকে ধন্যবাদ ম্যাডাম । আসলে এটাই আমরা দেখতে চাচ্ছি আগামী দিনগুলোতে ।

- আপনি নিশ্চিৎ থাকুন তবে এর ব্যাত্যয় ঘটলে আমাকে জানাবেন । চা খাবেন নিলু সাহেব ?

- এই গাড়িতে ?

আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে সবি পাবেন, এই বলে হেসে দিলাম । নিলুও হাসলো ।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে লাগলাম । তাকিয়ে দেখলাম গাড়িটা এগুচ্ছে বিজয় সরণি দিয়ে । রাত একটার ঘন্টি পড়লো ঘড়িতে ।

।। ৯ ।।

## সুধিজন পাঠাগার

নারায়নগন্জের সুধিজন পাঠাগারে আনুষ্ঠানিক ভ্রমণে যাব, যেখানে ছোটবেলায় যাতায়াত ছিল । বিজয় পার্টির নারায়নগন্জের নেতারা এসে বললো, ঢাকা থেকে নারায়নগন্জের পথে পন্চাশটি তোরণ নির্মান হবে । নারায়নগন্জের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তার পাশে ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আপনাকে অভ্যর্থনার জন্য । ঢাকার শিল্পীরা গান গেয়ে আসবে । শহর জুড়ে চলবে নাচ, গান আর মিছিল ।

আমি সাথে সাথে বললাম, এর একটিও হলে আমি যাচ্ছি না সুধিজন পাঠাগারে । আমার কথা শুনে থমকে গেল ওরা । আমি সুন্দর করে বললাম, চাচা, এসব করতো রাজা বাদশাহরা হাজার বছর আগে । এখন আমরা তথ্য যুগে প্রবেশ করেছি । তথ্য যুগে এসবের মূল্য নেই । আমার কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল । বড় বড় নেতারা চুপ করে বসে রইলো । আমি ওদের বুঝিয়ে হাসি মুখে বিদেয় করলাম ।

প্রাইম-মিনিস্টার হবার পর সুধিজন পাঠাগারে এসেছি । আগের মতনি আছে তবে এখন কম্পিউটার প্রযুক্তি বসেছে । ছোটবেলায় রেজিস্টারে নাম লিখিয়ে বই নিতাম, এখন সে সব পাল্টে গেছে । এখন বই নিতে হলে কম্পিউটারে এনট্রি দিয়ে নিতে হয় যেন সঠিকভাবে তথ্যটা রাখা যায় । আমাকে ওরা অনুরোধ করলো আরও কিছু কম্পিউটার দিতে যেন সদস্যরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরো তথ্য পেতে পারে । আমি ওদের আশ্বাস দিলাম ।

পাঠাগারের ভেতর হাঁটা দিয়েছি । হাঁটতে হাঁটতে যে টেবিলে পড়তাম, সেখানে এসে দাঁড়ালাম । যায়গাটা আগের মতনি আছে তবে ঘিরে রাখা হয়েছে যেন কেউ ব্যবহার না করতে পারে । টেবিলের গায়ে লেখা আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মারিয়া ফেরদৌসি হোসেন এখানে বসে পড়তেন । লেখাটা আমার ভাল লাগলো না, কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো । আমি এমন কেউ নই যে আমার নামে টেবিল বাঁধাই করতে হবে ।

আমি বললাম, যদি কিছু মনে না করেন তো আমার নামটা তুলে দেবেন । টেবিলটা উন্মুক্ত করে দেবেন সকলের জন্য ।

সুধিজন পাঠাগারের ব্যবস্থাপক একটু মন ভার করলেন কিন্তু সেটা গোপন করে বললেন, তাই হবে ম্যাডাম ।

আমি হেসে বললাম, ধন্যবাদ, আমার অনুরোধটা রাখবার জন্য ।

সুধিজন পাঠাগার থেকে বের হতেই সাংবাদিকরা এসে হাজির । থ্রি-এন এর নিলু, নাঈম আর নজরুলও এসেছে ।

নিলু বললো, আপনার নামের টেবিলটা উঠিয়ে দিলেন কেন ?

আমি বললাম,

আমার নাম হাজার স্থানে খোদাই করে কোন লাভ হবে না, যদি না আমি দেশের জন্য কিছু না করতে পারি । দেশকে যদি কিছু দিতে পারি তো মানুষের মনে আপনাতেই খোদাই হয়ে যাবো । হাতুর-বাটাল দিয়ে খোদাই করতে হবে না ।

এদিক থেকে একজন বললো, ওরা কিন্তু খুব মন খারাপ করেছে টেবিলটা উঠিয়ে দেয়াতে ।

আমি হেসে বললাম,

আমি জানি কিন্তু আমি খুশি হয়েছি উনারা আমার কথাটা রেখেছেন । আমার খুশিটা আরো বেড়েছে, যখন দেখলাম কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বইয়ের আদান-প্রদান চলছে ।

নিলু বললো, ওরা যে আপনার কাছে কম্পিউটার চাইলো, তার কি করবেন ?

আমি বললাম,

আপনারা তো জানেন সরকার তথ্য নির্ভর অর্থনীতি খাতে বরাদ্দ শুরু করেছে । তার আওতায় সুধিজন পাঠাগার কম্পিউটার পাবে । দেশের সব প্রতিষ্ঠানকে আমরা কম্পিউটার প্রযুক্তি দেবো, যতটুকুন পারা যায় ।

তখন নাঈম বললো, ম্যাডাম, কেমন লাগছে আপনার পুরোনো জায়গা ? সুধিজন পাঠাগার ?

- ভাল, খুব ভাল । মনে হলো আবার পড়তে বসি ।

নাঈম বললো, সত্যি সত্যি যদি পড়তে বসেন, কোন বইটা সবার আগে নেবেন ?

- ঝরা পালক, জীবনানন্দ দাশের কবিতার বই ।

- উনি তো আরো বই লিখেছেন, সেগুলো কেন বলছেন না ?

আমি হেসে বললাম, ঝরা পালক দিয়ে কবির শুরু, তাই আমারও শুরু হবে ঝরা পালক দিয়েই ।

থ্রি-এন এর নজরুল বললো, এই নারায়নগন্জ শহর নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা কি ?

আমি বললাম,

শুধু নারায়নগন্জ শহর নয় । পর্যায়ক্রমে সব শহরকে তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে মুড়ে ফেলতে শুরু করেছি আমরা । যার কাছে যত তথ্য থাকবে, সে তত এগিয়ে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক ।

এদিক থেকে একজন বললো, আপনার শৈশব কেটেছে এই শহরে । শৈশবের কোন স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম । মনে পড়লো প্রিন্সেসের কথা । বললাম, হু মনে পড়ে ।

- আমাদের সাথে শেয়ার করলে খুশি হতাম, এদিক থেকে একজন বললো ।

আমি বলতে লাগলাম,

আমি তখন ক্লাস টু-তে পড়ি । আমার একটা পুতুল ছিল । ইয়া লম্বা সোনালী চুল, তাই ওকে প্রিন্সেস ডাকতাম । প্রিন্সেস সব সময়ে আমার সাথে সাথে থাকতো বিশেষত রাতে ঘুমানোর সময় ওকে পাশে না শুইয়ে ঘুমুতে পারতাম না । কিন্তু সমস্যা হতো মাঝে মধ্যেই প্রিন্সেস হারিয়ে যেত এদিক ওদিক । বাবা, মামা আর দাদি মিলে খুঁজে দিতো । একবার হলো কি, সত্যি সত্যি হারিয়ে গেল প্রিন্সেস । বাড়ির উঠোন, আনাচে-কানাচে সব খোঁজা হলো । কোথাও নেই, বেমালুল গায়েব হয়ে গেছে পুতুলটা, এই বলে থেমে গেলাম । তাকিয়ে দেখলাম ঘরের সবাই চুপ করে আমার কথা শুনছে ।

আমি বলতে লাগলাম, আমার আর ঘুম আসে না । দাদা আমাকে নিয়ে গেলেন ওর ঘরে তারপর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার ঘরে দিয়ে গেলেন ।

পরদিন সকুল থেকে ফিরে আবারো খুঁজতে লাগলাম । আমার সাথে বিরাট সার্চ পার্টি । অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না প্রিন্সেসকে । দাদা আমাকে নিয়ে গেলেন শীতলক্ষাতে ঘুরতে ।

এভাবে চারদিন কাটলো । একদিন দাদার সাথে বাড়ির বাগানে হাঁটতে বেরিয়েছি । বাগানের শেষে প্রান্তে মস্ত শেওড়া গাছ, যেমন চওড়া তেমনি উঁচু । শেওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখি, একটি পিনক কালারের ছোট্র পা বেরিয়ে আছে শেওরার আগডালে । আমি সাথে সাথে দাদকে দেখালাম । লোক লাগানো হলো

গাছ বেয়ে উঠবার জন্য । তর তর করে উঠে গেল লোকটা তারপর ফিরে এলো জিনিষটা নিয়ে । আমি কাছে গিয়ে দেখলাম আমার প্রিন্সেস চোখ বুজে শুয়ে আছে । কদিনের রোদে মলিন হয়ে গেছে ওর চেহারা । ওকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে এলাম । তারপর ঝেড়ে মুছে গোছল করিয়ে নুতন জামা পরিয়ে দিলাম ।

নজরুল বললো, এতো জায়গা থাকতে শেওড়াতে উঠলো কেন প্রিন্সেস ?

নজরুলের প্রশ্ন করবার ধরন দেখে সবাই হেসে দিল । আমিও হাসলাম তারপর বললাম, আপনারা আন্দাজ করুন

সবাই চুপ হয়ে গেল ।

আমি বললাম, এর পেছনে আছে বানর ।

- বানর ?

আমি বললাম,

ইয়েস, তখন নারায়নগন্জ শহর গিজ গিজ করতো বানর দিয়ে । তেনাদেরি একজন প্রিন্সেসকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে শেওড়ার আগডালে ।

আমার কথায় সবাই হেসে দিল । আমিও হাসলাম ওদের সাথে ।

।। ১০ ।।

**ঘরের চোর**

ঘুম থেকে উঠতে আজ দেরি হয়ে গেল । ফজরের নামাজ পড়া হয়নি কারণ সুবেহ সাদিকে ঘুম ভাঙেনি । এর পেছনে রাতের বৃষ্টি কারণ হতে পারে । রাতভর বৃষ্টি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে ।

তড়িঘড়ি করে নামাজ সেরে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম । পিএস এসে সারাদিনের কর্মসূচী শোনাল । সবার আগে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে মিটিং । ফাইন্যান্স মিনিস্টারও থাকবে । আমরা সুদের হার নিয়ে আলোচনা করবো । সাধারণত আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যংক যে দিকে সুদের হার পরিবর্তন করে, অন্যান্য দেশ সেটা গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের সুদের হারে পরিবর্তন আনে ।

সভাকক্ষে সভা শুরু হলো । বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ফাইনান্স মিনিস্টার, অর্থ সচিব আর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা হাজির আছেন ।

আমি বললাম,

সবচেয়ে ভাল হয় সুদ বিশেষঙদের নিয়ে একটা কমিটি করুন । উনারা পরামর্শ দেবে কখন সুদের হার বাড়াতে বা কমাতে হবে ।

আমার কথা সবাই মেনে নিল ।

তারপর বললাম,

উন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে । আমার সরকারেরও তাই ইচ্ছে । প্যারালাল গভর্মেন্টের আওতায় সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে আমরা আলাদা করে দেবো সরকার থেকে যেন উনারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে । সরকারি কতৃত্বের তলে পড়ে উনারা যেন স্থবির না হয়ে যায় ।

আমার কথায় সবাই খুশি হয়ে গেল ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেই ফেললো, তাহলে ম্যাডাম, আমরা স্বাধীন হচ্ছি ।

আমি হেসে বললাম,

সংবিধান বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে কাজ করছে কিভাবে সরকার থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিচার বিভাগ, দূর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার, সম্পূর্ণ আলাদা করা যায় । ওদের জন্য আলাদা সচিবালয় থাকবে আর থাকবে আর্থিক স্বাধীনতা যেন সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারে ।

আমার কথায় আবারও সবাই খুশি হলো । বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবারও বললো,

আপনার প্যারালাল গভর্মেন্টের ধারণা আমাদেরকে সভ্য দেশের কথাই মনে করিয়ে দেয় । আপনাকে আবারো ধন্যবাদ, ম্যাডাম । ঐতিহাসিকভাবে আমরা দেখেছি, যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে সব দেশে মুদ্রাস্ফীতি কম থাকে কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সত্যিকারের ভুমিকা রাখতে পারে । স্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেকটা সুবিধে হলো, সরকার কখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করতে পারে না, যা তৃতীয় বিশ্বে সচারচর চোখে পড়ে ।

আমি হেসে বললাম,

সে সব কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন করা হচ্ছে, যেন সু-শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় । আশা করছি এক বছরের মধ্যে এসব করা যাবে ।

লান্চ আওয়ার শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ হলো । বিকেলে একটা মিটিং আছে, সেজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি । ফাইল ঘাটাঘাটি করছি সকাল থেকে । আমার পিএস এসে জানালো, থ্রি-এন এর নিলু সাহেব এসেছে । আমাকে নিয়ে ফিচার লিখছে । সে জন্য কিছু জিঙাসা করা চাই । জরুরি ভিত্তিতে এখনি দেখা করা দরকার ।

আমি বললাম, এখন তো দেখা করতে পারবো না । উনাকে পরে আসতে বলুন ।

হঠাৎ কি মনে হলো, কথা ঘুরিয়ে বললাম, ঠিক আছে আসতে বলেন ।

নিলু শাওকাত হোসেন ঘরে ঢুকলো । কেমন আলু-থালু, অসুস্থ্য দেখালো ।

আমি বললাম, আসুন, নিলু সাহেব । বলুন আপনার কি প্রশ্ন ?

নিলু বললো, আমার কোন প্রশ্ন নেই, আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি ।

- কিন্তু আপনি তো খবর পাঠিয়েছেন, এই মুহুর্তে কিছু জানা চাই আপনার ।

- হু বলেছি যেন কেউ সন্দেহ না করে ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

- তার আগে বলুন, এ ঘরে কোন আড়িপাতা যন্ত্র আছে ?

- না । সে ধরনের কিছু নেই তবে ঘরের বাইরে গিজ গিজ করছে ।

দেরি না করে ব্যাগ থেকে ছোট্ট টেপ রেকোর্ডার বের করলো নিলু সাহেব তারপর চালু করলো সেটা । দুজন ইংরেজিতে কথা বলছে অতি শুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় ।

একজন বললো, তাহলে আপনার সাথে প্ল্যান ঠিক হলো । আঠারই জানুয়ারি প্রাইম-মিনিস্টারের শেষ দিন ।

অন্যজন উত্তর দিল, ইয়েস, আপনি নিশ্চিৎ থাকুন । আঠারই জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেষ দিন । আমি সেভাবে জাল বিছিয়েছি ।

- আপনার পরিকল্পনাটা কি খুলে বলবেন ? উনি তো আঠার তারিখে সকুল ভিজিটে যাবেন, তারপর কি করবেন ?

- সেটা আমার উপরে ছেড়ে দিন । মিডিয়াতে সব জানতে পারবেন ।

- আপনার এ মিশনের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষীদের কেউ আছে ?

- না, কাজটা আমি একাই করবো । লোক বাড়ালে ফাস হয়ে যাবার ঝুঁকি ।

- ঠিক আছে । আমার ডিটেইলসের দরকার নেই । কাজ হলেই হলো ।

এই বলে দুজন চুপ । একটু পরে কিছু একটা খোলার শব্দ হলো । বুঝলাম সুটকেসের চেইন খোলা হচ্ছে ।

- এই সুটকেসে আপনার এ্যাডভানস । বাকিটা পাবেন কাজ শেষে ।

- ঠিক আছে, ধন্যবাদ । আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাই কারণ আমাদের পেছনে সব সময় টিকটিকি ঘুর ঘুর করে ।

- ঠিক আছে আসুন । গুড লাক ।

সারা ঘরে নেমে এলো পিন পতন নিস্তব্ধতা । কেউ কোন কথা বলছি না । আমার হাত পা অবশ হয়ে এলো ।

নিলু বললো, এ দুজনের কারো গলা আপনার পরিচিত ?

আমি বললাম, আবার ছাড়ুন ।

টেপ বাজতে লাগলো ।

টেপ শেষে বললাম, ইয়েস, একজনের গলা কোথায় যেন শুনেছি কিন্তু মনে আনতে পারছি না । আপনি চেনেন ?

- অবশ্যই চিনি ম্যাডাম, নিলু চাপাস্বরে বললো কথাটা । যে দুজন কথা বলছে, ওদের ছবিও তুলে এনেছি ।

আমি বললাম, দেখতে পারি ?

- নিশ্চয়, এই বলে ব্যাগ থেকে একগাদা ছবি বের করলো নিলু ।

দুজন লোক মুখোমুখি কথা বলছে ছবিতে । একজন ভিনদেশী মানুষ । ঠিক কোন দেশের বোঝা গেল না । সারা মুখে ব্রোনের দাগ, আঁটসাঁট জামা পড়েছে, থেকে থেকে ধুয়া ছাড়ছে সিগেরেটের । অন্যজনকে স্পাস্ট চেনা গেল । তিনি হলো আমার দ্বীতিয় নিরাপত্তা কমান্ড, যিনি দৌড়ে এসে আমার গাড়ির দরজা খুলে দেয় ।

অন্য ছবিতে টাকা ভর্তি সুটকেস বন্ধ করছে আমার দ্বীতিয় নিরাপত্তা কমান্ড ।

আমি বললাম, এসব তথ্য পেলেন কি করে ?

নিলু বললো,

ম্যাডাম, আপনার গোয়েন্দা সংস্থা যেমন খবর খুঁজে বেড়ায়, আমরাও খবরের অনুসন্ধান করি । সেই সূত্র ধরে জানতে পারি আপনার দ্বীতিয় কমান্ডের অনেক অপকীর্তির কথা কিন্তু ভদ্রলোক প্রমাণ রাখেন না । আপনার সিকুউরিটি চিফ কর্নেল গুলজারকে কোন ভাবে বিশ্বাস করানো যাবে না তার ডেপুটি একজন ক্রিমিনাল । গত সন্ধ্যায় আমি যাচ্ছিলাম শাহবাগের দিকে হোন্ডায় চড়ে । শাহবাগে এসে জ্যামে পড়ে গেলাম । একটা সাদামাটা ফিয়েট এসে দাঁড়ালো আমার পাশে । বিদেশী এক ভদ্রলোক বসে

আছে গাড়িতে আর তার পাশেই আপনার দ্বীতিয় নিরাপত্তা কমান্ড । ওরা যেন কি আলাপ করছে । আমার সন্দেহ হলো, আমি পিছু নিলাম ।

আমি বললাম, সন্দেহ হবার কি দেখলেন এখানে ?

নিলু বলে উঠলো,

ম্যাডাম, আমরা যারা সাংবাদিকতা করি তারা বাতাসের ভাও দেখে অনেক কিছু বলতে পারি তবে সব সময়ে যে ঠিক হয় তা নয় । তবে আপনার দ্বীতিয় নিরাপত্তা কমান্ড যে খারাপ মতলব আটছে, সেটা স্পষ্ট মনে হলো আমার ।

আমি বললাম, আপনাকে এক গ্লাস পানি দেই ?

- ইয়েস, পানি খেলে ভাল হতো কিন্তু আপনি বসুন আমি ব্যবস্থা করছি, এই বলে ব্যাগ থেকে পানি বের করলো । তারপর বলতে শুরু করলো,

ওদের গাড়ি এসে দাঁড়ালো সবুজ হোটেলে । গাড়ি থেকে নেমে ওরা হাঁটা দিল লিফটের দিকে । ধীরে ধীরে এগুচ্ছে ওরা । আমি মাথায় ক্যাপ আর সানগ্লাস পড়ে ওদের পিছু নিলাম । এই ভর সন্ধ্যায় সানগ্লাসে কেমন বেখাপ্পা লাগছিল, তারপরেও পড়তে হলো ।

লিফটের কাছে এসে দেখি অনেকে দাঁড়িয়ে । ওদের পেছনে দাঁড়ালাম কিছুটা দূরত্ব রেখে । কিছুক্ষণের মধ্যে লিফট চলে এলো । ওরা লিফটে উঠে দশতালার বাটন টিপলো । সবুজ হোটেলের একেবারে মাথায় যাবে ওরা । ওদের পিছু পিছু দশ-তলায় নামলে হয়তো ধরা পড়ে যাব, তাই নয় তলায় নেমে গেলাম অনেকের সাথে, তারপর সিড়ি বেয়ে দশতলার করিডরে এসে উঁকি দিলাম । দেখলাম লিফট থেকে নামছে ওরা, তারপর করিডরের মাঝামাঝি একটা ঘরে ঢুকলো ।

আমি গিয়ে দেখলাম ওদের ঘরের নম্বর ১০১০ কিন্তু ভারী দরজা থাকাতে ভেতরের টু শব্দও কানে আসছিলো না । আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম কিন্তু মনে মনে নিশ্চিৎ হলাম কোন ষড়যন্ত্র চলছে ।

একটু থেমে নিলু আবার বলতে লাগলো,

মাথায় কেবল ঘুরছে কিভাবে ওদের ট্র্যাক করা যায় । আমি সিড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলাম । গিয়ে দেখলাম মোটা মোটা পানির লাইন চলে গেছে । মাথায় একটা বুদ্ধি এলো । সরসর করে নিচে নেমে এলাম লিফট দিয়ে তারপর পাশের বাজার থেকে শক্ত দড়ি কিনে সেটা ব্যাগে পুরে হোটেলের ছাদে উঠে এলাম ।

আমি বললাম, আপনি নিশ্চয় এখন বলবেন না আপনি ছাদ থেকে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন ?

- এ ছাড়া উপায় ছিল না, ম্যাডাম, এই বলে নিলু হেসে দিল ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

নিলু বলতে লাগলো,

দশ-তলার করিডর আর ছাদে গিয়ে হিসেব করলাম ঠিক কোথায় ১০১০ নম্বর রুম । মোটামুটি মাঝামাঝি যায়গায় হবে । সে অনুযায়ী দড়িটা ছাদের পাইপের সাথে বেঁধে অন্য প্রান্তটা কোমরে বেঁধে আস্তে আস্তে নামতে লাগলাম ।

নিলু সাহেবের কথায় আমার গলা শুকিয়ে এলো । উঠে গিয়ে পানি খেয়ে এলাম । মনে হলো সাংবাদিকতার জন্য নিলু সাহেবকে যে পুরষ্কার দেয়া হয়েছে, সেটা না দিলে অবিচার করা হতো ।

আমার অবস্থা দেখে নিলু সাহেব বললা, ম্যাডাম, মনে হয় ভয় পেয়েছেন ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । বললাম, এর পর কি হলো ?

নিলু বলতে লাগলো,

দড়ি বেয়ে দশ তলায় নেমে এলাম । ভাগ্য ভাল প্রতি তলায় কার্নিশ দেয়া ছিল । সে কার্নিশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে কার্নিশ ধরে হাঁটা দিলাম । কিছুটা হাঁটতেই ১০১০ নম্বরের জানালা । দেখলাম দুই ভদ্রলোক বসে কথা বলছে । একজন হলো বিদেশী লোক আর দ্বীতিয় জন আপনার দ্বীতিয় নিরাপত্তা কমান্ড । তখনি ইশার আজান পড়লো । ঘড়িতে দেখলাম রাত সাড়ে আটটা ।

সারা ঘরে নেমে এলো নীরবতা । ব্যাগ থেকে পানি বের করে নিলু সাহেব খেল ।

আমি বললাম, পানি কি সব সময়ে সাথে রাখেন ?

- হু ম্যাডাম । বেশিক্ষণ পানি না খেয়ে থাকতে পারি না । কেমন শুকনো শুকনো লাগে ।

আমি বললাম, আপনাকে আমার ভান্ডার থেকে কিছু পানি দেই ?

নিলু হেসে দিল । বললো, আমারটা শেষ হলে আপনাকে বলবো ।

- ঠিক আছে ।

নিলু বলতে লাগলো,

ওরা কথা বলছে আর কোক খাচ্ছে । মিনি টেপরেকোর্ডারটা চালু করে দিলাম জানালার কার্নিশে । ফাকে ফাকে ছবি তুলছি । ভাগ্যিস রাত ছিল বলে আমাকে দেখা যাচ্ছিল না । নীরবে নিভৃতে ছবি তুলে চললাম ।

আমি বললাম, তারপর আবার ছাদে উঠলেন কি করে ?

নিলু বললো,

দড়ি বেয়ে ছাদে উঠবার ট্রেনিং আমার নেই, তাই সেদিকে ভাবলাম না । কিভাবে দড়ি বেয়ে নিচে নামা যায়, সেটাই ভাবতে লাগলাম । কিন্তু সমস্যা বাধালো পার্কিং । আমার নিচেই ছিল পার্কিং । গাড়ি আসছিল আর যাচ্ছিল । এখন কি করে নামি ? এখন নেমে এলে লোকজন ভাববে, এই ভর রাতে স্পাইডার ম্যান কোত্থেকে এলো ? এই বলে নিলু হেসে উঠলো । আমিও যোগ দিলাম ওর হাসিতে ।

নিলু বলতে লাগলো,

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত । এদিকে আলাপ সেরে ওরা ঘর বন্ধ করে চলে গেছে । আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দশতলার কার্নিশে । রাত বাড়তে লাগলো । দেখলাম গাড়ি পাকিং খালি হতে শুরু করেছে কিন্তু সমস্যা বাধালো বৃষ্টি । ঝির ঝির করে বৃষ্টি নেমে এলো ।

একটু থেমে নিলু বলতে লাগলো,

বাড়ির কার্নিশে কাককে ভিজতে দেখেছি কিন্তু নিজের অবস্থা যে তাই হবে, তা ভাবিনি । এভাবে কতক্ষণ ভিজেছি জানিনা । এক সময় বৃষ্টি থেমে এলো । গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাটা নীরব হয়ে এসেছে । সুর সুর করে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম তারপর ছাদে গিয়ে দড়িটা ব্যাগে পুরে বাড়ি ফিরে এলাম । অবশ্য অনেকেই পেছন ফিরে আমার ভেজা জামা-কাপড় দেখছিল ।

আমি বললাম, সেখান থেকেই বুঝি জ্বর বাধিয়েছেন ?

- কিভাবে বুঝলেন ?

- আপনি যে ভারী জামা-কাপড় চাপিয়েছেন, তাতে বলে দেয়া যায় ।

- না ম্যাডাম । আপনি দরদ দিয়ে তাকিয়েছেন বলে ব্যাপারটা ধরতে পারছেন । সত্যি আমার গায়ে জ্বর ।

- ডাক্তার দেখিয়েছেন ?

- হু ।

- কি বলেছে ?

- বুকে কফ জমেছে । এন্টিবায়োটিক দিয়েছে । পাঁচদিন খেতে হবে একটানা ।

আমি চুপ থেকে বললাম, আপনাকে গরম চা দেই ?

নিলু বললো, চায়ের কথা শুনতেই তেষ্টাটা ধাই ধাই করে উঠলো কিন্তু আপনি বানালে খাবো না । আমাকে বানাতে দিন ।

- ঠিক আছে বানান । টেবিলে সব দেয়া আছে ।

নিলু গিয়ে চা বানিয়ে আনলো । আমার হাতে এক কাপ দিয়ে নিজে এক কাপ নিল । চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, এত ঘ্রাণময় চা কখনো খাইনি । দেখছেন সারা ঘরে কেমন ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে ?

আমি বললাম, ফ্রান্সের এক ভদ্রলোক আমাকে উপহার দিয়েছে । আপনি নিয়ে যান প্যাকেটটা ।

নিলু হেসে দিল । বললো, আপনাকে ধন্যবাদ । তার দরকার পড়বে না ।

- ঠিক বলছেন তো ?

- হু, বলে নিলু মাথা নাড়লো ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, এই টেপ আর ছবি দিয়ে কি করবেন ?

নিলু বললো,

আপনার চিফ সিকিউরিটি কর্ণেল গুলজারের কাছে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেব আজ বিকেলে যেন কাল ভোরে পেয়ে যান । আশা করছি কাল ভোরেই এ্যারেস্ট হয়ে যায় ক্রিমিনালটা । ছবি আর টেপ কোনটাই অস্বীকার করতে পারবে না । সাজা হয়ে যাবে ওর ।

- আর আপনি ?

নিলু হেসে বললো, আমি আমার মতনই থাকবো কারণ কোন প্রেরকের নাম থাকবে না কুরিয়ারে । আপনি, আমি আর খুদা শুধু ব্যাপারটা জানবে ।

একটু থেমে নিলু বললো,

ভেবেছিলাম কর্ণেল গুলজারের কাছে পাঠিয়ে ক্ষ্যান্ত দেবো কিন্তু পরে মনে হলো যদি কোন কারণে জিনিষটা না পৌছে অথব্য তিনি খুলতে দেরি করেন । আপনার স্কুল ভিজিট ১৮ই জানুয়ারী আর সেটা চারদিন পরেই, তাই জানিয়ে গেলাম যেন ঝুঁকি না থাকে ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

নিলু বললো, এবার তাহলে উঠি । আপনার অনেক সময় নিলাম ।

আমি বললাম, একটু বসুন ।

নিলু বসে পড়লো, উঠতে নিয়ে ।

আমি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম,

ঠিক কিসের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দশতলার ছাদে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন ? সেটা কি নিছক সাংবাদিকতা ?

চুপ হয়ে গেল নিলু কিছুক্ষণের জন্য, তারপর বললো,

তথ্য নির্ভর অর্থনীতি আর প্যারালাল গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে এই প্রথমবারের মতন, হয়তো আর কখনো এ সুযোগ আসবে না, আর সেটাকে রক্ষা করতেই নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম ।

আমার চোখে পানি এসে গেল কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে হেসে দিলাম ।

নিলু এবার দাঁড়িয়ে বললো, এখন আমি আসি । ভাল লাগছে এই ভেবে আপনাকে সব জানিয়ে যেতে পারলাম ।

আমি বললাম, আপনার সাথে ফেরবার ট্র্যান্সপোর্ট আছে ?

- আছে ম্যাডাম, এ নিয়ে ভাববেন না ।

আমি বললাম, আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না, তবে আপনার কথা মনে থাকবে চিরকাল ।

নিলু হেসে দিল । কিছু বললো না । আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে ।

একটু পরে পিএস এসে বললো, ম্যাডাম, চারটা বেজে গেছে । আমাদের বের হতে হবে ক্যান্টনমেন্টের মিটিংয়ে ।

আমার গাড়ি ছুটে চলেছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে । আমার সাথে আছে আমার প্রেস সেক্রেটারী । গাড়ির আগে-পিছে চাপ চাপ রক্ষীরা পাহাড়া দিচ্ছে । ডানে তকিয়ে দেখলাম আমার দ্বীতিয় নিরাপত্তা কমান্ড পাশের গাড়ি থেকে ওয়ারলেসে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে । আমার হাসি পেল কিন্তু হাসলাম না । মনে এসে ভর করলো একটা মানুষের কথা, যে তথ্য নির্ভর অর্থনীতি আর প্যারালাল গভর্মেন্ট প্রতিষ্টার জন্য দশ তলার কার্নিশে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে ।

।। ১১ ।।

## আড়াই বছর পরে

ওয়াশিংটনের জনবহুল শহর সিয়াটলে এসেছি দুদিনের জন্য । ছিম-ছাম সুন্দর পুরোনো শহর, এদিকে এগুলে কানাডার বর্ডার । এই শহরেই রয়েছে ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন । । ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন আমাকে দাওয়াত করেছে 'প্যারালাল গভর্মেন্ট, তথ্য-অর্থনীতি আর বাংলাদেশ' শীর্ষক এক ঘন্টার বক্তৃতা দেবার জন্য । ইউনিভাসিটির হল ঘরে আয়োজন হয়েছে এসবের । বক্তৃতার পর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব আছে ।

এ হলো সকালের প্রোগ্রাম আর বিকেলে Seattle Tower দেখতে যাব । শহরের মাঝে Seattle Tower । ওখানে ছোটখাট অনুষ্টান হবে । সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সিয়াটল টাওয়ার বেয়ে একজন উঠে যাবে আর সেটা আমাকে দেখানো হবে ।

হল ঘরে বক্তৃতা শেষ হলো । তালিতে তালিতে ভরে উঠলো ঘর । ঝাড়া এক ঘন্টা বক্তৃতা দিয়েছি । এখন প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, ওয়াশিংটন ইউনিভাসিটির ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন রাখবে ।

এক ছাত্রী দাঁড়িয়ে বললো,

তোমার সরকারের আড়াই বছর পার হলো । নির্বাচনের আগে যা যা অঙ্গীকার করেছিলে, তার কতটুকু করতে পেরেছে ?

আমি বললাম, অর্ধেকের মতন । বাকীগুলো করবো আগামী আড়াই বছরে ।

- আর যদি না করতে পার ?

আমি হেসে বললাম, তখন দেশের কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না ।

এদিক থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললো,

নির্বাচনী ওয়াদায় তুমি বলেছিলে বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, দূর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরকার থেকে আলাদা করে দেবে যেন প্যারালাল

গভর্মেন্ট হিসেবে ওরা কাজ করতে পারে । তুমি তোমার কথা রেখেছো, সংবিধানে পরিবর্তন এনে এসবের ব্যবস্থা করেছো । তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এসবের জন্য । তৃতীয় বিশ্বের সরকাররা সাধারণত এতখানি ছাড় দেয় না, যেন তাদের কতৃত্ব কমে না আসে । ঠিক কিসের জন্য এই ছাড়টা দিলে ?

আমি হেসে বললাম, তৃতীয় বিশ্বের তালিকা থেকে আমার দেশ যেন বাদ পড়ে, সে জন্য ছাড় দিয়েছি ।

- ঠিক কবে নাগাদ তৃতীয় বিশ্বের তালিকা থেকে নাম কাটাতে পারবে ? এদিক থেকে এক ছাত্রী জানতে চাইলো ।

- এ হিসেবটা একটু ভেবে বলতে হবে তবে আগামী এক যুগে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য আর শিক্ষার মোটামুটি হিল্লে সকলের জন্য হবে বলে আশা করছি ।

- তোমাদের মূল সমস্যা কি জানতে পারি ?

আমি বললাম,

আমাদের সমস্যার শেষ নেই তবে সব কিছু ছাপিয়ে শিক্ষার স্বল্পতা আমাদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে । একজন অশিক্ষিত মানুষকে পথ দেখালেও সে এগুতে পারে না কারণ জানার স্বল্পতা তাকে বার বার বাধা দেয় অথচ শিক্ষিত কাউকে একটু এগিয়ে দিলে সে তর তর করে উঠে যায় । তাই শিক্ষা আর তথ্য খাতে সবচেয়ে জোড় দিয়েছি আমরা ।

- সে জন্য বুঝি তোমাকে তথ্য প্রধানমন্ত্রী ডাকা হয় ? ডান থেকে একজন বলে উঠলো ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

একজন বললো, তথ্য নির্ভর অর্থনীতি করবার প্ল্যানটা কিভাবে তোমার মাথায় এলো ?

- অক্সফোর্ডে পড়বার সময় নানা ধরনের মানুষের সাথে আমার আলাপ হয় । এদের অনেকে অসাধারণ পরিশ্রমী ছিল কিন্তু তথ্যের অভাবে কাজটি করতে পারতো না অথচ তথ্যটা দিলে ঠিক ঠিক কাজটা শেষ হতো । তখন থেকে আমার মনে হয়েছে, তথ্যটা দিতে হবে সবার আগে যেন কাজটি শেষ করা যায় ।

- তোমার দেশেও কি সেই অবস্থা ?

আমি বললাম,

আমার দেশে অনেক সম্ভাবনাময় লোক আছেন, যারা তথ্যের অভাবে কাজটি করতে পারেন না । ওদের চাই তথ্যটা । তথ্যটা থাকলে ঠিক ঠিক কাজটা গুটাতে পারতো ।

এদিক থেকে একজন বললো, এবার অন্য কথা বলি । তুমি এত ক্ষুদ্রকায় মন্ত্রীসভা নিয়ে দেশ চালাচ্ছ কিভাবে ?

আমি বললাম,

আমার সরকারের আয় কম, তাই মন্ত্রীসভা ছোট করেছি যেন সরকারের ব্যয় কমে আসে । ছোট-বড় মন্ত্রীসভা বড় কথা নয়, কথা হলো উনারা দক্ষ কিনা, কাজ জানেন কিনা বা আমলাদের সাহায্য ছাড়া কাজ গুটাতে পারেন কিনা । আমি সেরা লোক দিয়ে মন্ত্রীসভা সাজিয়েছি যেন উনারা একাধারে কয়েকটা মন্ত্রণালয় চালাতে পারে ।

- সে জন্যই বুঝি তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী, আবার অর্থমন্ত্রীও ?

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

এদিক থেকে একজন বললো, তুমি যে বললে তোমার সরকারের আয় কম । আয়টা কি বাড়ানো যায় না যেন তুমি বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নিতে পার ?

আমি বললাম,

আয়টা বাড়ানো যেত যদি আস্থার সংকটটা না থাকতো । দেশের জনগন যদি নিশ্চিৎ হতো যে তাদের দেয়া ট্যাক্সের টাকাটা সরকার দক্ষতার সাথে ব্যয় করবে, তবে সরকারের আয় অনেকগুণ বেড়ে যেত কিন্তু সে আস্থাটা আমরা আজও তৈরি করতে পারিনি ।

- এই আস্থা বাড়ানোর উপায় কি ? এদিক থেকে একজন বললো ।

- যখন আমার সরকার সত্যিকারের দেশ সেবক হবে, সেদিন আস্থাটা এমনিতেই বাড়বে । ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আস্থা বাড়ানোর প্রয়োজন পড়বে না ।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ । কে কি প্রশ্ন করবে ভাবছে । এরি ফাকে একটু পানি খেয়ে নিলাম । তাকিয়ে দেখলাম এক টুকরো সূর্যের আলো এসে পড়ছে আমার টাবিলের ধারে ।

এদিক থেকে একজন বলে উঠলো, তুমি তো অনেক ছোট, ত্রিশের কোঠা পার হওনি । এত অল্প বয়সে দেশ চালাতে অসুবিধেয় পড়তে হয় না ?

আমি হেসে বললাম,

সে তো বটেই । বার বার হোচট খেয়েছি কিন্তু সব সময় আমি যোগাযোগ রেখেছি আমার উপদেষ্টাদের সাথে যেন সমস্যার একটা হিল্লে করা যায় । মুরুব্বিদের সাথে না বুঝে আমি পা ফেলিনি ।

অন্য একজন বললো, তোমার সরকারের সব চেয়ে বড় চ্যালেন্জ কি ?

- তথ্য নির্ভর অর্থনীতি আর প্যারালাল গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠা করাই আমার সরকারের চ্যালেন্জ । এটা ছিল আমার নির্বাচনী ওয়াদা আর ওয়াদা পূরণ করাই আমার ধর্ম ।

- ধর্ম বলতে তুমি কি বোঝ ?

আমি বললাম,

ধর্মের সংজ্ঞা একেক জনের কাছে একেক রকম । আমার কাছে নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করাই ধর্ম । যতটুকু ওয়াদা পূরণ করবো, ততটুকু আমি ধার্মিক ।

একজন শিক্ষক দাঁড়িয়ে বললো, ব্যক্তিগত কোন দূর্বলতা তোমার আছে, যা দেশ চালাতে বাধার কারণ হয় ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

ইয়েস, আছে, তা হলো জানার স্বল্পতা । দেশ চালাতে অনেক তথ্য চাই কিন্তু সব আমার জানা নেই । তখন বিপদে পড়তে হয় ।

- তখন কি করো ?

- পড়াশোনা শুরু করি দেই রীতিমত । লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আসি, ইন্টারনেট থেকে ফাইল ডাউনলোড করি, বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনায় বসি । ফলে একটা হিল্লে করা যায় । প্রতিদিন তিন-চার ঘন্টা পড়াশুনা করি আমি সব বিষয় নিয়ে ।

একজন বললো, আমেরিকায় আসবার আগে কি পড়েছো ?

- আমেরিকার ইতিহাস আবারো ঝালাই করেছি । আব্রাহাম লিনকনের জীবনী আবারও পড়লাম ।

একজন শিক্ষক দাঁড়িয়ে বললো,

বিশাল এই আমেরিকার অর্থনীতি গড়বার পেছনে কোন শক্তিটা বেশি কাজ করেছে বলে তুমি মনে করো ?

আমি হেসে বললাম,

সব কিছু ছাপিয়ে এদেশের Intellectual Community সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে । নূতন-নূতন তথ্য-তত্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমে এরা বিশ্বমানের দ্রব্য আর সেবা তৈরি করেছে, যা আমেরিকাকে সমৃদ্ধ করেছে । যে দেশ যত নূতন-নূতন, তথ্য-তত্ব বানাতে পারবে, সে দেশ তত এগিয়ে যাবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু এর জন্য চাই জ্ঞানী-গুণী লোক আর মার্কিন মুল্লুকে তার ঘাটতি নেই । সত্যি কথা কি, এক সাথে এত ঙানী-গুণীর সমাবেশ মার্কিন মুল্লুক ছাড়া আর কোথাও নজরে পড়বে না, তাই তথ্য-অর্থনীতির তালিকায় আমেরিকা শীর্ষে নাম লিখিয়েছে ।

একজন বললো, তুমি কি তোমার দেশেও গুনী-গুণী লোক বাড়াতে চাচ্ছ যেন নূতন নূতন দ্রব্য-সেবা তৈরি করা যায় ?

- এক্সাক্টলি তাই, এই বলে আমি হেসে দিলাম ।

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ হয়েছে । একজন ঘোষনা করলো অনুষ্ঠান শেষ হবার কথা । সবার সাথে হাত তালি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি । ওরা আমাকে ক্রেস্ট উপহার দিলো অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য । তারপর ধীরে ধীরে মন্চ থেকে নেমে গাড়িতে এসে বসলাম ।

গাড়ি বহর আমাদের নিয়ে ছুটে চলেছে সিয়েটল টাওয়ারের দিকে । কিছুক্ষণ যেতেই সিয়াটল টাওয়ার চলে এলো । মস্ত উচু টাওয়ার । মাথাটা থালার মতন চ্যাপ্টা, মনে হয় কোন ভীনগ্রহের মানুষ মাথা উচিয়ে আছে ।

আমার সাথে অনেক গনমান্য ব্যক্তি আছেন । যে লোকটা সিয়েটল টাওয়ারে উঠবে, তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো । ছিপছিপে লোকটা কিন্তু দেখতে অন্য সব মানুষের মতন । আমি বার বার তাকাচ্ছিলাম ওর হাতের মুঠোর দিকে এই ভেবে যে, ওগুলো হয়তো চ্যাপ্টা-কাটাযুক্ত, যা দিয়ে ও আকড়ে ধরবে টাওয়ারের গাত্র, তারপর তর তর করে উপরে উঠে যাবে ।

লোকটা উঠতে শুরু করলো । টিকটিকি যেমন শরীর বাঁকিয়ে উঠে যায় উপরে, ঠিক তেমনি লোকটা আঁকাবাঁকা হয়ে উঠতে লাগলো । নিমিষেই চলে গেল উপরে । আমরা হা করে তাকিয়ে আছি । কিছুক্ষণ যেতেই লোকটা ছোট হয়ে এলো । এক পর্যায়ে বিন্দুর মতন দেখা গেল ।

এবার নামবার পালা । হামাগুড়ি দিয়ে নামছে লোকটা । টিকটিকির মতন একেবেকে নামছে । ক্রমেই বড় হয়ে এলো । পনের তলায় এসে হঠাৎ একটা খাম্বা ধরে ঝুলে পড়লো লোকটা । আমরা সবাই আতকে উঠলাম, অনেকের গলা দিয়ে শব্দ বের হলো । পাশে বসা ভদ্রমহিলা বললো, ভয় পাবেন না ম্যাডাম । দর্শকদের চমক দেবার জন্য ও ঝুলে পড়েছে ।

আমার মনে পড়লো থ্রি-এন এর নিলু শাওকাত হোসেনের কথা । এ লোকের না হয় পেশাই এটা, তাই ঝুলতে অসুবিধে নেই কিন্তু নিলু সাহেবের তো এসবের বালাই নেই । শুধুমাত্র তথ্য নির্ভর অর্থনীতি আর প্যারালাল গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য সেদিন সে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ।

অনুষ্ঠান শেষ করে গাড়িতে চড়ে বসেছি । গাড়ি চলতে শুরু করতেই মোবাইল বের করে আনলাম ব্যাগ থেকে । মোবাইলের স্ক্রিনে নাম দেখে এগুচ্ছি । নিলু নামটা আসতেই বাটন টিপে দিলাম । জানি না নিলু সাহেবকে পাব কিনা কারণ আজ থেকে এক বছর আগে নাম্বারটা নিয়েছিলাম । কিছুক্ষণের মধ্যে ফোন বাজতে লাগলো । একটু পরে ফোন তোলবার শব্দ,

- স্লামলায়কুম, নিলু শাওকাত হোসেন বলছি ।

End

Please write your comments about this to me at : sayed.hossain@yahoo.com

Please visit my personal website: www.sayedhossain.com

February 24, 2010